এপ্রিল সংখ্যা - ২০২৩

একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী

চেতনার অন্বেষণে

২৬-তম প্রকাশ



বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তন তত্ত্বের মূল্যায়ন
- মাহাথির আহমেদ তুষার

বাঙালির ধর্মসংস্কৃতির সঙ্কট
— বশিষ্ঠদেব ঠাকুর

এক রসসাহিত্যিকের অলৌকিক নরকযাত্রা
— অশোক কুমার দাস

নাটক: চেন্নী
- অনুপ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রের ধর্ম
— রামকৃষ্ণ সাহা

একটু আগুন চাই
— সজল কান্তি টিকাদার

বিশেষ সংযোজন

দেবতার জন্ম
শিবরাম চক্রবর্তী

শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে
- প্রবীর ঘোষ

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

Back Cover button

সম্পাদকীয়

ইউনিয়ন মিনিস্টার সত্যপাল সিং সেদিনই একগাদা রিপোর্টারদের সামনে বলল, ডারউইন থিয়োরি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল এবং স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে তা সরিয়ে দেওয়া দরকার। আমরা সেদিন কথা শুনে হাসাহাসি করেছি লাঞ্চ টেবিলে বসে। চারমাসের মধ্যে সিলেবাস থেকে তা তুলে দেবে জানতাম কি তখন?

যারা খোঁজ রাখে, সচেতন, তারা ভয় পায় এই ক্ষমতাবান লোকেদের থিংকিং এবিলিটি দেখে। With great power comes great responsibility, এমন সব নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ওপর রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে রেখেছি যাদের না আছে কোনও প্রপার শিক্ষা, না আছে তাদের শেখার ইচ্ছে কিন্তু হাতে আছে সিক্স ইনফিনিটি স্টোন। তাই পাবলিকের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিলে তা চলে না সবসময়। সাম্প্রতিক উদাহরণ যখন গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা আমরা পাবলিককে দোষ দিয়েছি এসির জন্য, এতে আসল পরিবেশ দূষণকারী কোম্পানীদের থেকে চোখ সরে গেছিলই।

পাবলিক সিস্টেম নিয়ন্ত্রিত। আমাদের পেরেন্টসরাও পাবলিক। তৃণমূল যখন এসএসসিতে তুমুল চাকরি ঘুষের বিনিময়ে পাইয়ে দিচ্ছিল, পাবলিক তা নিয়েছে। অনেকে মনে করেন এতে যারা চাকরি নিয়েছে ও দিয়েছে দুইই সমান দোষী। আমি একেবারেই তা মনে করি না। যার ক্ষমতা বেশি এই দুয়ের মধ্যে তারই দোষ বেশি, কারণ সে সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা রাখে।

কাল যদি দেখি যে আমার সন্তান শুধুমাত্র কটা নাম্বারের জন্য ভালো স্কুল না পায়, আমার শঙ্কিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তীব্র প্রতিযোগীতার পাশাপাশি ওমুক তমুক মিশন স্কুলেও টাকা দিয়ে ব্যাকসাইডে ভর্তি করিয়ে নেয়। তাই একগাদা বাচ্চাকে ক্লাস এইটে ফেল করিয়ে শীট খালি করে দেওয়া থেকে শুরু

করে মিড-ডে মিলের চাল, আদানি স্টক সবকিছুতেই এত দুর্নীতির পাঁকে ডুবে থাকতে থাকতে বাবা-মায়ের অতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়া, সমাজ নিয়ে আশাহত হওয়া স্বাভাবিকই। সিস্টেম তা করতেই চায় বরং।

এটি ইভলিউশনেরই একটা অবস্থা, আমরা পরিবেশে পরিস্থিতির সাথে এতকাল মানিয়ে এসেছি। এটুকুতে সিদ্ধান্ত টেনে ফেললেও ভুল হয়, প্রতিটি মানুষের সচেতন থাকা উচিত যে সে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, তার একটা সমাজ নামক জিনিস আছে, তার মগজ যেমন আছে তার সামাজিক পরিবেশও জটিল অঙ্কে বাঁধা তাই রাজনৈতিক সচেতন থাকার শিক্ষা প্রতিটি মানুষের গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত, ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে হলেও।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মোদীসহ বিভিন্ন মিনিস্টার এত পরিমানে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ছড়িয়েছে তাতে আপামর মানুষের ভয়ই পাওয়া উচিত। কখনও বলছে গরু অক্সিজেন দেয়, মাইথোলজির রামসেতু বড় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উদাহরণ, প্রাচীন ভারতে এরোপ্লেন ছিল, শাঁখ বাজিয়ে করোনা ভাইরাস দূর করা যায়, গরুর মুত্রে ক্যানসারের মত রোগ সেরে যায়। জেনেটিক সায়েন্স প্রাচীন ভারতে ছিল, কারণ কর্ণ মায়ের গর্ভে যেহেতু জন্মায়নি, এটি বলেছিলেন আর কেউ নয়, আমাদের পিএম। বিজেপি ফর্মার চিফ মিনিস্টার রমেশ পোখরিয়াল বলেছিলেন – “Astrology is the biggest science. It is, in fact, above science. We should promote it” এররকম আরও শখানেক যোগ করে দেওয়া যায় যেগুলি বিজেপি নেতামন্ত্রীরা বিভিন্নসময় বলেছে। এবং তাদের স্ট্রংগেস্ট আইটিসেল তা প্রচারও করেছে। উচ্চশিক্ষায় বরাত কমেছে। এরকম অন্ধকারযুগ ভারত আগে কখনও দেখেনি এবং এরকম কল্পনা করেছিল কিনা জানি না।

যারা এই ধরনের ‘above science’ এর প্রচার করে চলে তাদের কাছে ইভলিউশনের মতো তত্ত্ব তো গায়ে জ্বলুনি ধরাবেই। মৌলবাদীদের মূল চরিত্র এটিই, সে বাংলাদেশের

মুসলিম মৌলবাদই হোক বা ভারতের হিন্দুত্ববাদ তাদের ধর্মীয় অন্ধত্বকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর।

আর সেই অন্ধকার ছড়ানোর ডিউটি যখন ক্ষমতাবানেরা নেয়। এবং একটা ডিস্টোপিয়ান নোংরা সমাজ তৈরির দিকে যখন এগোতে থাকি তখন মানুষের আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই একটা আল্টিমেট ইনফিনিটি স্টোন জনগণের হাতে সবসময় ছিল ও আছে, উদয়ন পন্ডিতের কথায়, 'দড়ি ধরে মারো টান'।

ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস' থেকে একলাইন লিখেই আজকের মত শেষ করি, "In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed." মানুষ একসাথে থেকে এই সলিউশনও নিশ্চয় করবে, আমরা সাধারণ মানুষ এই আশা সবসময় করি ও করে এসেছি।

৩০ এপ্রিল, ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

ম্যাগাজিন পড়ার অভিজ্ঞতা সুন্দর করতে আপনাদের ইনসিস্ট করছি অ্যাডোবি রিডার, মুন রিডারের মত অ্যাপ ব্যবহার করুন। পুরো পত্রিকাটি ইন্টারেক্টিভ রেসপন্স করা থাকে অর্থাৎ সূচিপত্রে যে লেখাটি পড়তে চান সেটি "... পাতায়" লেখাটিতে ক্লিক করলেই স্ক্রল না করেই উক্ত লেখাটিতে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারবেন।

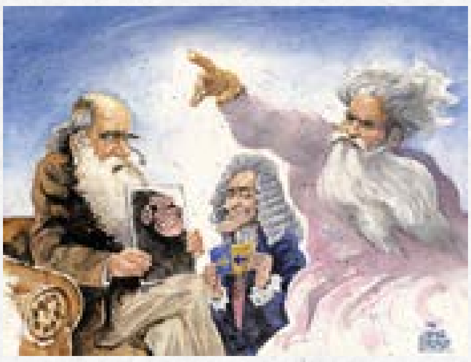
সার্ভেতে দেখলাম ৪৮ শতাংশ পাঠকই 'ড্রাইভ পিডিএফ ভিউয়ার' অ্যাপ অর্থাৎ মোবাইলের ডিফল্ট অ্যাপই ব্যবহার করেন কিন্তু এই অ্যাপে ইন্টারেক্টিভ রেসপন্সের সুবিধা নেই এবং পিডিএফ স্টোরের সুবিধা নেই।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ - নিবন্ধ - গল্প - নাটক:

সংগঠিত ধর্ম কোনওদিন ডারউইনকে পছন্দ করেনি

— শম্ভুনাথ চার্বাক



৫৪ পাতায়

অলৌকিক নয়, লৌকিক

— মহম্মদ মহসীন



৬২ পাতায়

বহিষ্কৃত ছাত্র ও শিক্ষককুলের অধোগতি

— অনির্বাণ পাত্র চৌধুরী



৬৫ পাতায়

ডিরোজিও: যে ঝড়ের পাখিকে প্রয়োজন আজও

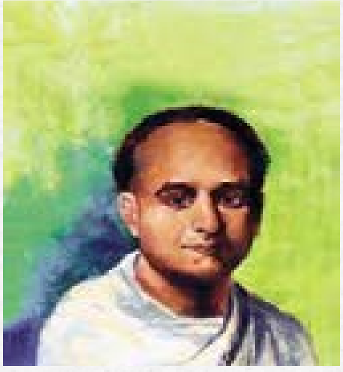
— অভিষেক দে



৭২ পাতায়

CIE ঈশ্বরচন্দ্র ‘বিদ্যাসাগর’ ঔপনিবেশিক শিক্ষার আদর্শ

– স্বপন জানা



৭৭ পাতায়

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

— তন্ময়



৮৩ পাতায়

একশো দিনের কাজের প্রয়োজনীয়তা

— দিলীপ দাস মণ্ডল



৮৫ পাতায়

সততা, নৈতিকতা কিংবা মানবিকতার অভাবই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ?

— মাধব রঞ্জন সরকার



৮৮ পাতায়

পরিবেশের জন্য এসি কতটা বিপদজ্জনক?

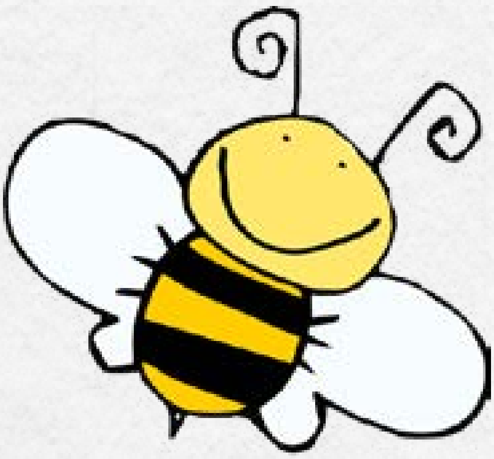
— তাঞ্জন বোস



৯৯ পাতায়

মৌমাছি সমাজে শ্রমিকরাই চালিকাশক্তি, তাদের জীবন চলে ঘড়ি মেপে, অঙ্ক কষে,কাজ করে আর নেচে গেয়ে

— পঞ্চানন মণ্ডল



১০২ পাতায়

ভগৎ সিং ও তাঁর চিন্তাভাবনা

— মঞ্জুশ্রী সামন্ত



১০৮ পাতায়

অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে ৫০ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ

– সন্তোষ শর্মা

১১০ পাতায়

লং লিভ প্রবীর ঘোষ

— চিত্রদীপ সোম



১১৬ পাতায়

প্রসঙ্গ:প্রবীর ঘোষ

— রাজু দত্ত



১২২ পাতায়

প্রবীরদার ভালো-মন্দ

— মধুসূদন মাহাত



১২৫ পাতায়

একটা কাঠ ও আমি: কথোপকথন ১

— অমিত দাস



১২৮ পাতায়

গাছেদের কথা

— রাজু দত্ত



১৩১ পাতায়

সংকল্প

— জনা বন্দ্যোপাধ্যায়



১৩৫ পাতায়

এক রসসাহিত্যিকের অলৌকিক নরকযাত্রা

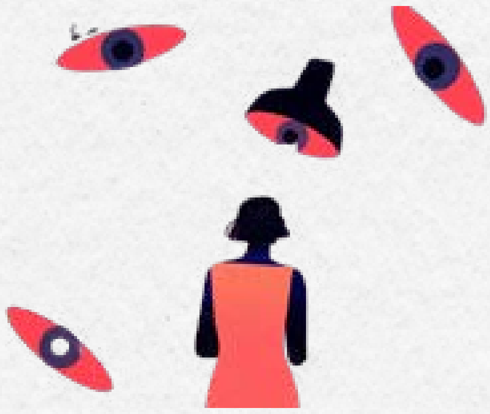
— অশোক কুমার দাস

(রম্যরচনা)

১৩৭ পাতায়

নাটক: চেন্নী

– অনুপ চক্রবর্তী



১৫৩ পাতায়

স্মরণে প্রবীর, মননে প্রবীর

– মণীশ রায়চৌধুরী



১৭৯ পাতায়

কবিতা

নিশিগন্ধারা আজ আর ফুল হয়ে ফোটে না

— তরুন মান্না



১৮৬ পাতায়

পার্থনা

– অশোক চার্বাক দাস



১৮৮ পাতায়

ঈটস্ মুভ

— তারক নাথ সাহা



১৯৪ পাতায়

প্রবীর ঘোষ

— বিপ্লব সেন



১৯৫ পাতায়

রাষ্ট্রের ধর্ম

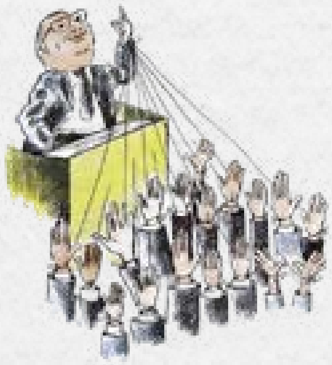
— রামকৃষ্ণ সাহা



১৯৭ পাতায়

হুজুরের গোলাম

— প্রিন্সি বেরা



১৯৯ পাতায়

দূষণে প্রকৃতির সর্বনাশ

– বিপ্লব সেন



২০১ পাতায়

মন্ত্রিমশাই

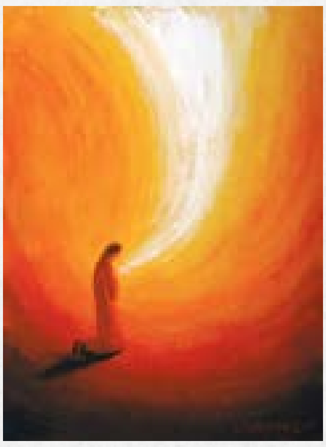
– তাপস কুমার সরকার



২০৪ পাতায়

একটু আগুন চাই

– সজল কান্তি টিকাদার



২০৬ পাতায়

যুক্তিবাদী যোদ্ধা প্রবীর ঘোষের উদ্দেশ্যে

— মিহির



২০৯ পাতায়

বি শে ষ সং যো জ ন

দেবতার জন্ম

– শিবরাম চক্রবর্তী



২১০ পাতায়

শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে

– প্রবীর ঘোষ



২২১ পাতায়

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি। পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও। যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে 'চেতনার অন্বেষণে'র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী

সুমন কর্মকার, তন্ময়

এবং

রাজু দত্ত-কে

তিনজনেরই বলিষ্ঠ লেখার সাথে আমরা পরিচিত, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।



বিজ্ঞান শিবির

আগামী ২৭ ও ২৮শে মে , সায়েন্স অ্যাক্টিভিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে দু দিন ব্যাপি একটি বিজ্ঞান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। খাওয়া দাওয়া ও রাতে থাকার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় কক্ষে ছাত্র ও ছাত্র ছাত্রীদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা আছে , বাড়ি থেকে মশারি , বিছানার চাদর আনতে হবে। রাজ্যের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আসন সংখ্যা সীমিত ও এই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিষ্ট্রেশন ফি সমেত। যে কোন সমস্যায় বা জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে ফোন করুন **9635578948** এ। আপনারা অনেকের ভরসায় এই উদ্যোগ বিশেষ করে যারা আমার কাজ পছন্দ করেন। আপনাদের বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন।

College, University students also may come for astronomy and astrophotography

অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ফর্মটি পূরণ করে নিন তাড়াতাড়ি।

https://forms.gle/Pfqzd2bDN8H28kA29

বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

প্রতিমাসে "চেতনার অন্বেষণে"র পক্ষ থেকে বুক ক্লাব মিটিং হচ্ছে, যেখানে মাসে একটি করে বই পড়তে দেওয়া হয় এবং মাসের শেষে আলোচনা করি।

বিস্তারিত পাবেন টেলিগ্রামে। তাছাড়াও যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তকদের প্রয়োজনীয় বই প্রায় ১৮০০টি ক্যাটালগসহ পাবেন। যুক্ত হওয়ার জন্য টেলিগ্রামে সার্চ করবেন **@Yktibadira**

পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়ম, ঠিকানা ও নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য বিস্তারিত শেষের কভার পাতায় দেওয়া রইল।

শেষের পাতায় যাওয়ার জন্য বাটনটিতে ক্লিক করুন

শেষের কভার পাতায় যান

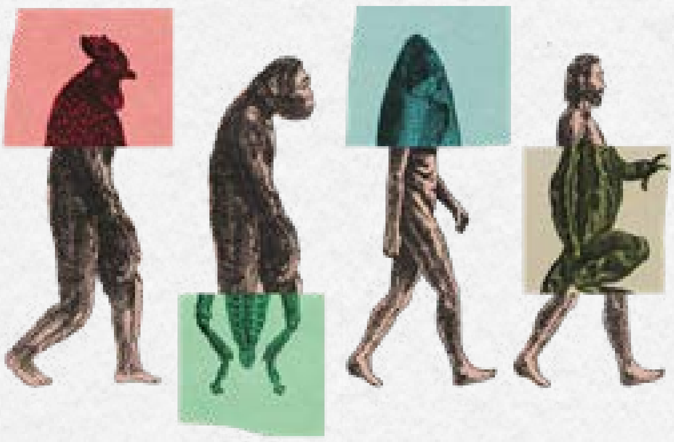
"চেতনার অন্বেষণে" পত্রিকা পড়ুন ও অন্যাকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

এটি একটি মুক্তচিন্তক মাসিক সাময়িকী।

সূচিপত্র

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তন তত্ত্বের মূল্যায়ন

লিখেছেন - মাহাথির আহমেদ তুষার



উনিশ শতকে চার্লস ডারউইন যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ On the Origin of Species প্রকাশ করেন, তখনও বিবর্তন তত্ত্ব কেবল একটা অনুকল্পরূপে ছিল। আজ প্রায় দেড়শো বছর পর বিবর্তন তত্ত্ব একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

"বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব" বা Scientific Theory ব্যাপারটা আসলে কি?

সাধারণভাবে "তত্ত্ব" কথাটাকে যতো হালকা ভাবে নেয়া হয়, বিজ্ঞানের বেলায় ঠিক ততোটাই ভারী একটা ব্যাপার সেটা। কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার সর্বোচ্চ সঠিক ব্যাখ্যা।

দ্যা স্ট্যানফোর্ড এনসাক্লোপিডিয়া অব ফিলোসোফির ভাষ্য-মতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে, "A scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that can be repeatedly tested and verified in accordance with the scientific method, using accepted protocols of observation, measurement, and evaluation of results. Where possible, theories are tested under controlled conditions in an experiment." (১)

আরেকটু সহজ করে বললে, “(বারবার) পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হাইপোথিসিসকেই থিওরি বলে।” কোনও অনুকল্প বা হাইপোথিসিস বার বার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার পরপরই কেবল সেটা “থিওরীর” মর্যাদা পায়। কোনও হাইপোথিসিস অপ্রমাণিত হলে বিজ্ঞানের কোনও দায় পড়ে না তাকে কোলে নিয়ে বসে থাকার। এমন উদাহরণ অসংখ্য। স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত “A Brief History of Time” গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে, “একটা তত্ত্বকে ভাল তত্ত্ব বলা যেতে পারে যদি সে তত্ত্ব দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অল্প কিছু স্বীকৃত নিয়মের ভিত্তিতে দাঁড় করানো কোনও মডেল যদি পর্যবেক্ষণের একটা বিরাট অংশকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যায়; এবং যদি সেখান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কেও নিশ্চিত ও নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করা যায়।”

বিবর্তন তত্ত্ব তেমনি এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স এর ভাষ্যমতে, “বিজ্ঞানীরা প্রায়শই পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করতে “সত্য” শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে তাঁরা সত্যকে এমন কোনও কিছু বোঝাতে ব্যবহার করতে পারেন যা এতবার পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আরও পরীক্ষা করা বা প্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না। এই অর্থে প্রজাতির বিবর্তনের ঘটনাটি একটি সত্য। বংশগতীয় পরিবর্তন আদৌ হয় কি না সেটা আজ আর প্রশ্ন কিংবা দ্বিধার আওতায় নেই, কারণ এর পক্ষে খুবই জোরালো প্রমাণ রয়েছে।”

একই সুরে বলেছেন হারমান জোসেফ মুলার। তাঁর “One Hundred Years Without Darwinism are Enough” প্রবন্ধের শেষ দিকে বলেছেন, “ভাবনা, অনুমান, তত্ত্ব, নীতি

এবং সত্যের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম পার্থক্য নেই। তবে, ধারণাটির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য থাকে। যখন আমরা কোনও জিনিসকে সত্য বলি, তার অর্থ হলো এর সম্ভাবনা অত্যধিক — এতটাই বেশি যে আমরা এটি সম্পর্কে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকে না এবং সেটি মেনে নিই। এখন সত্যের এরকম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একদম সঠিক বিষয় হচ্ছে, বিবর্তন তত্ত্ব একটি সত্য বা ফ্যাক্ট।" (২)

এ ব্যাপারে দ্যা প্যালিওন্টোলজিকাল সোসাইটির বক্তব্য আরও স্পষ্ট—

"বিবর্তন তত্ত্বকে একটি "সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট" ও "বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব" দুটোই বলা হয়।

বিবর্তন তত্ত্ব "প্রকৃতির এক বাস্তবতা" বা "ফ্যাক্ট" এই অর্থেই যে, জীবের জীবন প্রতি মুহুর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতি-তে প্রজাতি সমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয়ে চলছে এবং নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটছে। জীবাশ্ম রেকর্ড হচ্ছে বিবর্তন তত্ত্বের প্রাথমিক পর্যায়ের এক প্রমাণ। বিবর্তন তত্ত্বকে আরও জোরালো ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করতে পেরেছে বৈজ্ঞানিক আরও নানান ক্ষেত্র যেমন— তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্যা (comparative anatomy), বায়োজিওগ্রাফি, জেনেটিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি ইত্যাদি। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া সহ অন্যান্য অনুজীবের প্রকৃতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ নিয়ে গবেষণাও বিবর্তন তত্ত্বকে প্রমাণ করে।

অন্যদিকে, বিবর্তন তত্ত্বকে একটা "তত্ত্ব" বলা হচ্ছে এ কারণেই যে— এটি পৃথিবীর ইতিহাসজুড়ে ঘটা জীবের জীবনের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বকে নানানভা-বে অসংখ্যবার পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সবসময়ই নিশ্চিত হওয়া গেছে এর সত্যতা। আরও স্পষ্ট করে বললে, বিব-

র্তন তত্ত্ব এমন একটা পরিচ্ছন্ন তত্ত্ব, যেটা জিওলজিকাল টাইমে পৃথিবীর ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। জীবজগতের বংশগতীয়, আণবিক ও শারীরিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা সহ পেরেছে পুরো জীবজগতের বৈচিত্র্যতা ব্যাখ্যা করতে। বিবর্তনীয় প্রিন্সিপালগুলি হচ্ছে বেসিক ও অ্যাপ্লাইড বায়োলজি, জীবাশ্মবিদ্যা, বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ গবেষণার মূল ভিত্তি।” (৩)

প্রতিনিয়তই বিবর্তন তত্ত্ব ব্যবহার করে ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ ও এদের সংক্রমণের ফলে সৃষ্টি রোগের প্রতিষেধক বানানো হচ্ছে। এই তত্ত্ব ব্যবহার করে অভয়ারণ্য নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জিনতত্ত্ববিদেরা বিবর্তন তত্ত্ব ব্যবহার করে আমাদের জিনোমের তথ্য উদঘাটন করছেন। বর্তমান সময়ে গবেষনাকারীরা এক নতুন ধরনের জীনতত্ত্ব বা ইভো ডেভো(Evo-Devo) ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিজমের মধ্যে বিবর্তন প্রক্রিয়া ট্রেস করতে পারেন। এই প্রত্যেকটি ব্যবহারিক দিকই হলো বিবর্তনের জন্য এক একটি পরীক্ষা। কারণ, যদি ব্যবহারিক দিকগুলো অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয় তবে বিবর্তন তত্ত্ব-ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। কিন্তু বিবর্তন তত্ত্ব একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী তত্ত্ব হিসাবে সময়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। (৪)

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার করি। কোনওকিছু “বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব” হিসেবে তখনই স্বীকৃতি পায়, যখন এটি চারটি শর্ত মেনে চলে।

শর্ত চারটি হচ্ছে:

(১)মিথ্যা–প্রতিপাদনযোগ্যতা (Falsifiability),

(২)পর্যবেক্ষণযোগ্যতা (Observability),

(৩)পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (Repeatability),

(৪)পূর্বাভাসযোগ্যতা (Predictability)

পৃথিবীতে যে কয়টি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে, সবগুলিই এ চারটি

শর্ত মেনে তবেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। (৫)

মিথ্যা–প্রতিপাদনযোগ্যতা শর্তটার দিকে তাকানো যাক— কোনও তত্ত্বকে অবশ্যই এ শর্তের আওতায় থাকতে হবে। যেমন ধরুন, আপনি যদি কোনওভাবে দেখাতে পারেন, আলোর চেয়ে বেশি গতির কোনওকিছু আছে মহাবিশ্বে। তাহলে থিওরি অব রিলেটিভিটির মতো একটা তত্ত্বকে নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে। যদি কখনও দেখাতে পারেন, গাছ থেকে আম মাটিতে না পড়ে হুট করেই আকাশে উড়ে গেছে কোনও প্রকার বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই—তাহলেও মহাকর্ষ তত্ত্বকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। অর্থাৎ, প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির অবশ্যই মিথ্যা–প্রতিপাদনযোগ্যতা থাকতে হবে। যেটা বিবর্তন তত্ত্বের আছে।

পর্যবেক্ষণযোগ্যতা হচ্ছে, এ তত্ত্বটি যেন পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়। আবার, পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা হচ্ছে, প্রতিবার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেন একই ফলাফল আসে। মানে, একটা তত্ত্বের মেকানিজম সমূহকে যতোবারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক না কেন, তার ফলাফল একই হতে হবে। যদি না হয়, তাহলে ভাগাড়ে ফেলা হবে। সবশেষে আসে, পূর্বাভাসযোগ্যতা বা সহজ ভাষায়, ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা। একটা তত্ত্বকে অবশ্যই এ ক্ষমতা থাকতে হবে। যেমন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব থেকে কৃষ্ণ-গহ্বরের অস্তিত্ব থাকার একটা ভবিষ্যদ্বাণী এসেছে। আজকে সেটা প্রমাণিত। প্রতিটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিবর্তন তত্ত্বের কি সে ক্ষমতা আছে?

অবশ্যই আছে। বলা হয়েছিল মানুষ ও শিম্পাঞ্জি একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। তাই হলো, জেনেটিক্যালি ৯৬% সাদৃশ্যতা সহ আরও নানান প্রকার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। উভয়ের ক্রোমোজমের একই স্থানে পাওয়া গেছে HERV, একই স্থানে পাওয়া গেছে ন্যানোগ প্রোটিন জিন; মানব ক্রোমোজম-২ এর ফিউসন থেকে, Foxp2 জিন থেকে—অসংখ্যভাবে এর প্রমাণ মিলেছে! (৬) প্রমাণ মিলেছে পাখি ও স্তন্য-

পায়ীদের একই পূর্বপুরুষদের আসার মতো ভবিষ্যদ্বাণী।(৭)

এরকম অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণীর পরিক্ষিত প্রমাণ আজকে আমাদের হাতের কাছে।(৮)

কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পারমাণবিক তত্ত্ব, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, মহাকর্ষ তত্ত্ব, প্লেট টেকটনিক্স তত্ত্ব, বংশগতীয় তত্ত্ব সহ বিজ্ঞানের সব প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মতো বিবর্তন তত্ত্বও উপরোল্লিখিত চারটি শর্ত মেনেই একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। শুধু তাই না, এখন পর্যন্ত এই তত্ত্বের মেকানিজমগুলিরই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই হয়েছে। বিবর্তন নিয়ে কি পরিমাণ গবেষণা হয়, সে ব্যাপারে আপনাদের একটু ধারণা দিই—শুধুমাত্র বিবর্তন তত্ত্ব নিয়েই পৃথিবীতে ৩০০টি জীববিজ্ঞান জার্নাল পেপার প্রকাশ করে যাচ্ছে। আজ অবধি কেবল এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির-ই ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার পেপার পাবলিশ হয়েছে। একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ইম্পেক্ট ফ্যাক্টরের জার্নাল হচ্ছে, Nature Reviews Molecular Cell Biology, যার ইম্পেক্ট ফ্যাক্টর ৯৪.৪৪। যেখানে কোনও জার্নালের ইম্পেক্ট ফ্যাক্টর মোটামুটি ১০ ধরলেই সেটাকে excellent quality ধরা হয়। প্রতিবছর শুধু বিবর্তন তত্ত্ব নিয়েই স্বতন্ত্রভাবে শত শত গবেষণা প্রকাশিত হয় পৃথিবীর এই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জার্নাল থেকে।(৯)

এরপরও এমন প্রতিষ্ঠিত সায়েন্টিফিক তত্ত্বকে এক কথায় “স্রেফ একটা মতবাদ” যদি বলে বসেন, এ ব্যর্থতা আপনারই। আপনারই বোধশক্তির চরম সীমাবদ্ধতা। আপনারই পড়াশোনার ঘাটতি। বিখ্যাত বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ারের ভাষ্যে, “বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তি এতোটাই নিশ্চিত যে প্রায় সব জীববিজ্ঞানী বিবর্তন তত্ত্বকে একটি “ফ্যাক্ট” হিসেবে বিবেচনা করেন। বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তি এতোটাই নিশ্চিত যে প্রায় সব জীববিজ্ঞানী বিবর্তন তত্ত্বকে একটি “ফ্যাক্ট” হিসেবে

বিবেচনা করেন।” (১০)

দেখুন, একুশ শতকের বিজ্ঞানের স্ট্রাকচারই এরকম যে, এখানে বিবর্তন ছাড়া অন্য কোন তত্ত্ব আসার প্রশ্নই আসে না। কিভাবে এলাম আমরা, কেন বিভিন্ন প্রাইমেটদের একই রোগ জীবাণু আক্রমণের দীর্ঘ হিস্ট্রি, এতো এতো ট্রানজিসনাল ফসিলের কিসের যোগসূত্র ইঙ্গিত করে, কেন ব্যাক্টেরিয়ারা রেজিস্ট্যান্ট হয়, কেনই বা আমাদের শরীরে এখনও রয়ে গেছে এমবিওটদের(পাখি, সরীসৃপ) ভগ্ন জিন ভিটেলোজেনিন, কেনই বা আমাদের দ্বিতীয় ক্রোমোজম ফিউজ, আমাদের অতীত, ভূত-ভবিষ্যৎ—সবকিছুর উত্তর পূণ্যশ্লোকের কোনও কিতাবে কখনও পাওয়া যাবে না। যেতে হবে বিজ্ঞানের কাছে। বিজ্ঞান এ সবকিছুর উত্তর যে তত্ত্বের মাধ্যমে এস্টাব্লিশ করেছে, সেটা এই থিওরি অব ইভোলিউশন।

বিবর্তন মানে কী? বিবর্তন মানে descent with modification- এক জীবের পপুলেশানে পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য জীবের আবির্ভাব। এখন ধরে নিন কেউ বলছেন- কোন এক প্রজাতির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব ভুল। এই কথাটার মানে কী? এই কথাটার মানে এই প্রজাতিটা অন্য কোন জীব থেকে আসেনি। তার মানে কোথা থেকে এসেছে? হয় হাওয়া থেকে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই আপনাআপনি তৈরি হয়েছে, অথবা (সচরাচর মানুষ যেটা ইমপ্লাই করে) অলৌকিক কোন উপায়ে এসেছে। আজকের দিনের বিজ্ঞানের গোড়ার কথাই হচ্ছে লৌকিক কার্যকারণের ভিত্তিতে সবকিছু ব্যাখ্যা করা। আপনি যদি আপনার আমার অরিজিনকে কোনও ‘বিশ্বাস’ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান। আমার তাতে আপত্তি নেই। বিশ্বাস, তার নিজের জায়গায়।

আমি সোজা কথায় বলি, কেন ভূমিকম্প হয়, সেটুকুর empirical আর সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আপনি জানতে চাইলে কোথা থেকে জানতে হবে?

সেটা জানতে আপনাকে 'প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব' নামে বিজ্ঞানের এক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে। বিকল্প, প্রমাণিত কোনও ব্যাখ্যা নেই।

একই ভাবে আমাদের মানুষ হিসেবে আবির্ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিয়ে জানতে কেবল এবং কেবল মাত্রই "থিওরি অব ইভোলিউশন" এর দ্বারস্থ হতে হবে। এরচেয়ে আর কোনও ওয়েল এস্টাব্লিশড তত্ত্ব বিজ্ঞানে নেই। বাচ্চাদের প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব পড়ানো ক্ষতিকর না হলে ইভোলিউশন পড়াতেও ক্ষতি দেখি না। নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে বিজ্ঞানের জায়গাটা কোথায়, এটুকু জানার অধিকার সব মানুষের আছে।

আমাদের তৃতীয় বিশ্বের এই বিজ্ঞান না জানা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের কাছে তুড়ি মেরে বিজ্ঞান নিয়ে মিথ্যাচার করা সহজ হতে পারে। কিন্তু এতে করে বিজ্ঞানের এস্টাব্লিসড কোনও-কিছুকে আনএস্টাব্লিস করা যায় না। নাসার ওয়েবসাইটে উঁকি দিয়ে দেখে আসুন না, Life এর বিজ্ঞানভিত্তিক ডেফিনিশন হিসেবে কি ফিক্স করল তারা। তাদের ভাষ্যে, "Life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution". (১১)

এই সেদিনও, ২০২২ সালে সুইডিশ গবেষক সাভান্তে পাবো নোবেল পেলেন, মানুষেরই আরেক প্রজাতি নিয়ান্ডারথালের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করে। ২০১০ বিশ্ববিখ্যাত Science জার্নালে (ইম্পেক্ট ফ্যাক্টর ৬৩.৭১) তাঁর এ কাজটি প্রকাশিত হয়। এরপরের সুদীর্ঘ এক যুগের রিভিউয়ের পর তাঁর এ সম্মাননা। শুধু তাই না, এ নোবেল লরিয়েট একই

গবেষণায় মানুষ এবং পূর্ববর্তী হোমিনিন পূর্বপুরুষদের জিন ট্রান্সফারের ব্যাপারটিও প্রমাণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের ওয়েবসাইটে নীচের লিংকে দেয়া আর্টিকেলটায় চোখ বুলিয়ে আসতে পারেন। (১২)

তাই বলছি, কোনও এস্টাব্লিশড সায়েন্টিফিক তত্ত্বকে অস্বীকার করা, মানুষকে মিসলীড করাটা মোটেও ঠিক না। আমি সেটাকে মোরালি ইনকারেক্ট-ই ভাবি। বিশ্বাস থাকুক বিশ্বাসের জায়গায়। আমরা সেটাকে নাহয় নিজের মতো করে ধারণ করে চলি। আর বিজ্ঞান থাকুক বিজ্ঞানের জায়গায়। একটা আরেকটাকে স্পয়েল করে দিচ্ছে, এমনটা ভাবতেই হবে কেন বলুন?

তথ্যসূত্রঃ

(১) "The Structure of Scientific Theories". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016.

(২) Muller, Hermann Joseph (April 1959)। "One Hundred Years Without Darwinism Are Enough",

(৩) The Paleontological Society Position Statement: Evolution

(৪) Evolution: Fact and Theory | National Center for Science and Education.

(৫) Emergence and Modularity in Life Sciences, Lars Wegner, page-15

(৬) আত্মীয়তার প্রমাণাদি, মাহাথির আহমেদ তুষার | বিজ্ঞানব্লগ | প্রকাশকাল: ২ জুলাই, ২০২১

(৭) Brawand, D. Wahli, W., & Kaessmann, H.(2008). Loss of egg yolk genes in mammals and the origin of lactation and placentation. PLoS Biology, 6(3), e63.

(৮) Evolution Predictions | Talk Origin.

(৯) Updated List of High Journal Impact Factor Evolution Journal.

(১০) Mother, Ernst (198). Tiered a New Philosophy of Biology: Observations of Go Evolutionist. Cambridge.

(১১) https://astrobiology.nasa.gov/research/life-detection/about/#:~:text=The%20NASA%20definition%20of%20life,Organic%20Life%20in%20Planetary%20Systems

(১২) www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/advanced-information/

সূচিপত্র

বাঙালির ধর্মসংস্কৃতির সঙ্কট

লিখেছেন – বশিষ্ঠদেব ঠাকুর



প্রথম পর্ব:

গোখলের বিখ্যাত উক্তি - What bengal thinks today,India thinks tomorrow, এই কথাটি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই ধর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাঙালি প্রায় তেরশ বছর ধরে ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, কারণ অনেকেই মনে করেন আদি শঙ্করাচার্যের পরমগুরু, অদ্বৈক বেদান্তবাদের প্রথম প্রবক্তা গৌড়পাদ, বাঙালিই ছিলেন, এই গৌড়পাদের অদ্বৈতবাদের "ব্রহ্ম" আসলে ব্যক্তি ঈশ্বরকে,স্বর্গ নরককে অস্বীকারই করে এবং নাগার্জুনের শূন্যবাদের কাছাকাছি এক দর্শন। তাঁর মতবাদকেই শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই আচার্য শঙ্করই বৌদ্ধদের মতো মঠকেন্দ্রিক হিন্দুধর্মের সূচনা করেন।

এরপরের বাঙালি নাস্তিক পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান - যিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন এবং বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

পরের সাধকও প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার কারণেই তৎকালীন

শাসকদের চক্ষুশূল ছিলেন হয়ত এই কারণেই বাঙালি ও সারা ভারত তাঁকে ভুলে গেছে, অথচ তাঁর শিষ্য গুরু গোরক্ষনাথকে সকলেই চেনেন!

আনুমানিক 10ম থেকে 12শ শতকের মধ্যে, বাংলা ভাষার আদি কবিদের অন্যতম মৎস্যেন্দ্রনাথ (সিদ্ধাচার্য লুইপাদ) ছিলেন নাথ ধর্মের প্রবর্তক, তাঁর দুই শিষ্য হলেন, গুরু গোরখনাথ ও চৌরঙ্গিনাথ, – যিনি পালবংশের সন্তান ছিলেন!

এরপর ভক্তিযুগের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন চৈতন্যদেব, যিনি অন্যান্য ভক্তিবাদী সন্তদের মতো শুধুই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির কথাই বলেননি, একজন সমাজসংস্কারকও ছিলেন, যিনি বলেছিলেন, “চন্ডালোপি দ্বিজঃশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ”

তাঁর শিষ্য সনাতন গোস্বামীকে নির্দেশ দেন বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র রচনা করতে, সুদীর্ঘ তন্ত্রধর্মের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব ভক্তিপ্লাবনে ভেসে যায়। তাঁরই ভাবধারায় রচিত হয় বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব।

এই সময় বাংলায় আরেকটি ধর্মসাহিত্য–ধারার সূচনা হয় যা সমগ্র ভারতে অভিনব – মঙ্গলসাহিত্যের ধারা, যা পুরাণসাহিত্যের আদলে রচিত হলেও এর মাধ্যমে বৈদিক, অবৈদিক এবং ঐশ্লামিক ধারার সংশ্লেষ শুরু হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরাণিক দেবদেবীদের বিরুদ্ধে লৌকিক ও স্থানীয় দেবদেবীদের মাহাত্ম্য এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়,

এভাবেই উঠে এল ওলাবিবি, বনবিবি, ধর্মগাজন, সত্যপীর (যিনি পরবর্তীকালে সত্যনারায়ণ হন), ওলাইচন্ডী, যেখানে ওলাইকে চন্ডী হিসেবে মেনে নেওয়া হল, এভাবেই অন্ত্যজদের ধর্মসংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এই সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটা পূর্ববঙ্গে হয়নি, ফলে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবটা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম থাকলেও সেখানকার নিম্নবর্গের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেন!

তাই Richard M. Eaton পূর্ববঙ্গের মুসলিম প্রাধান্যের কারণ ধর্মান্তরণ না বলে Islamisation বা ইসলামিকরণ বলেছেন।

এবং এটা তাদের অজান্তেই হয়েছে এটাও বলেছেন, অর্থাৎ সেখানকার অধিবাসীরা আল্লাহ্ কে অন্যান্য দেবতার মতোই আরেক দেবতা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে। এই বিষয়ে পরবর্তী পর্বে বিস্তৃত আলোচনা করব।

বাংলার মঙ্গলকাব্যে দেবতার মানবায়ন হয়েছে যা রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা" তাই এখানে দুর্গাপূজা আসলে দুর্গার (মেয়ের) বাপের বাড়িতে আসা। অথচ সেই সময় সারা ভারতের ভক্তিকবিদের কাছে দেবদেবীরা অনেকটা সামন্তপ্রভুর মত ছিলেন অর্থাৎ এক্ষে-ত্রেও বাংলা অন্যপথের পথিক!

একই সময়ে আরেক বাঙালি মধুসূদন সরস্বতী বারাণসীতে বসে বিশুদ্ধ জ্ঞানকাণ্ডের অদ্বৈতবাদকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দর্শনে পরিণত করেন, এই মধুসূদন সরস্বতীকেই সম্রাট আকবর অব্রাহ্মণদের সাধু করে মন্দির রক্ষা করার পরামর্শ দেন। যার ফলে নাগাসাধুদের সংগঠিত করা হয়। এক্ষেত্রেও বাঙালিই পথপ্রদর্শক!

বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায় যিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজই ভারতে সমাজ সংস্কারমুলক আন্দোলনের সূচনা করে,

রামমোহন একই সঙ্গে ছিলেন প্রগতিশীল আধুনিক ও যুক্তি-বাদী ধ্যানধারণার সমর্থক।

রামমোহন ও বিবেকানন্দের মাধ্যমেই অদ্বৈত বেদান্ত আধুনিক যুগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র আনন্দমঠের লেখক ও সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করাটা, তাঁর অসামান্য বহুমুখী সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা ভুল তো বটেই তবে তিনিই প্রথম, যিনি মহাভারত রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনি, থেকে অলৌকি-কতা বাদ দিয়ে কাহিনিগুলোকে আধুনিক দৃষ্টিতে বিশ্লষণ করতে চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে রামমোহন থেকে ইয়ং বেঙ্গল তা থেকে বিদ্যাসা-

গর অক্ষয়কুমার-দের প্রাচীন চার্বাকদের উত্তরসূরী হিসেবে বলা যেতেই পারে, যাঁরা ভারতীয় সমাজে যুক্তিবাদী ভাবধারার সূচনা করেন, যদিও এই ধারাটা বিভিন্ন কারণে জনপ্রিয় হয়নি বলেই বাংলার নবজাগরণ যা শুধুমাত্র সাহিত্যকেন্দ্রিক ছিল তা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি!

এবং এঁদের যুক্তিবাদী ভাবধারার জনপ্রিয়তার অভাবেই হিন্দু সংস্কার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনে পর্রবসিত হয়।

এর বিপ্রতীপে হলেন রামকৃষ্ণ, যিনি আপাত অতি সাধারণ "যত মত তত পথ"-এর কথা বলেন, যেখানে বহুসম্প্রদায়ের সহ অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বলেন।

এই সহিষ্ণুতারই আজকের ভারতে ভয়ংকর অভাব, এটা ঠিকই, সহ অস্তিত্বের কথা, সহিষ্ণুতার কথা বুদ্ধ মহাবীর প্রথম বললেও বা "রুচীনাম্ বৈচিত্র্যাত্ ঋজু কুটিলনানাপথ" -এর কথা বহু আগে উল্লেখ করা হলেও, কোন পথটা ঠিক, কোনটা বেঠিক এর চেয়ে বড় কথা "সংবাদ", পরস্পর আলাপ আলোচনা এভাবেই সামাজিক সম্প্রীতি বজায় থাকে, কারণ সমাজের সব মানুষ যুক্তিবাদী হয়ে যাবেন এটা যেমন অসম্ভব তেমনি বিভিন্ন ধর্মের, সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও তা অযৌক্তিক মনে হলেও অন্যের ভিন্ন মতকে মেনে নেওয়াটাও প্রয়োজন, এই বার্তাটা রামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ"-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, যেটা গান্ধীও গুরুত্ব দিয়েছেন, আজ যখন দেখি পাকিস্তানে শিয়া ও আহমেদিয়া-দের মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে।

নবরাত্রিতে ও জৈন পর্বে মাছ মাংস বন্ধের দাবী তোলা হচ্ছে তখন এই ভিন্ন ভাবনাকে মর্যাদা দেওয়াটাও "যত মত তত পথ" থেকেই সম্ভব। অতীতেও 'মছলিখোর বাঙালি'র বিরোধীতা উত্তর ভারতে হত, বর্তমানে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা নিরামিষ খাওয়াটাই আদর্শ হিন্দু আহার বলে জনমানসে প্রচার করতে পেরেছে।

এপ্রসঙ্গে গোহত্যা নিবারণী সংস্থার জনৈক ভক্তের সঙ্গে বি-

বেকানন্দের কথোপকথন স্মরণীয়।

বিবেকানন্দ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য কিছু করতে বলছেন, সেখানে জনৈক গোভক্ত মানুষের চেয়ে গোরুকে রক্ষা করাটাই ধর্মরক্ষা ভাবছেন।

বিবেকানন্দ খ্রিষ্টান মিশনারীদের অনুসরণ করে হিন্দু সমাজেও সেবার ধারণাকে জনপ্রিয় করেন, অথচ হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা দলিত হিন্দুদের ক্ষমতায়নের বদলে মন্দির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করাটা ও ইতিহাসের বিকৃতি করাই হিন্দুরক্ষার উপায় বলে গণ্য করেছে।

বিবেকানন্দর গীতার কর্মযোগের ব্যাখ্যা সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনেককে প্রেরণা জুগিয়েছিল অর্থাৎ দেশসেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরসেবাও সম্ভব সেটাও একজন বাঙালিরই ভাবনা ছিল।

বিবেকানন্দ, যিনি ইউরোপ আমেরিকায় হিন্দু ধর্মপ্রচারের পথিকৃৎ তাঁর পথেই অন্য বাঙালিরা - পরমহংস যোগানন্দ থেকে ইসকনের অভয়াচরণরা ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় সাধুরা রজনীশ মহেশ যোগী প্রভৃতি যাঁরা যোগ ও আধ্যাত্মিকতাকে বিপণন করেই বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এভাবে দেখা যায় বাঙালিরা বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য ছাড়া ধর্মক্ষেত্রেও সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সময় থেকেই হিন্দু মহাসভা তারপর সংঘপরিবার বাংলায় তাদের অনুপ্রবেশ বাড়াতেই রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার শুরু করে,

এই দুই হিন্দু সংগঠনের ভাবনা বাংলার ঐতিহ্যের পরিপন্থি, এদের মাধ্যমেই উত্তর ভারতের জাতপাতসর্বস্ব উগ্র পুরুষতান্ত্রিক ধর্মভাবনা বাঙালির মনকে আজ আচ্ছন্ন করেছে।

এই সংগঠনগুলোকে প্রথম থেকেই আর্থিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বাংলার অবাঙালী গুজরাটি ও মাড়োয়ারি ব্যব-

সায়ীরাই, তাই বর্তমানে সিনেমা থেকে টিভি সিরিয়াল সর্বত্রই বাংলার সনাতন দেবদেবী, আচার-অনুষ্ঠানের বদলে উত্তর ভারতীয় ধর্মাচরণকে প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে পরিকল্পিত-ভাবেই।

আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামেও রাম ও হনুমান মন্দির গড়ে উঠেছে।

অন্যদিকে বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদাহরণ -

যেখানে মজনু শাহ্, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, রামা-নন্দ গোঁসাই, নুরুল উদ্দিনরা একসঙ্গে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, অথচ ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে সাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রচার করা হয় এর ফলেই তিতুমীরের আন্দোলন থেকে মোপলা বিদ্রোহ এমনকি সিপাহী বিদ্রোহেও জেহাদি ভাবনার প্রভাব দেখা যায়।

পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের মাধ্যমে বাংলার শিক্ষা থেকে সাংস্কৃতিক জগতে পৌত্তলিকতার বিরোধীতা করতে গিয়ে উগ্র নারী বিরোধী সামন্ততান্ত্রিক আরবি সংস্কৃতির প্রচার প্রসার শুরু হয়।

1937 সালে মোহাম্মদ আক্রম খাঁর নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতীক "শ্রী" ও

"পদ্ম" -এর বিরোধীতা শুরু করে, এভাবেই তারা ধুতি শাড়ির বিরোধীতা শুরু করে।

এমনকি 1937 সাল নাগাদ মুরারিচাঁদ কলেজের পত্রিকার প্র-চ্ছদে একটি রাজহাঁসের ছবি ছিল, এবং কলেজ - সঙ্গীতেও ছিল "সুর্মা তীরের আমরা মরাল, কলেজ মোদের রঙমহল"। এই "মরাল" শব্দের বিরোধীতা শুরু হয়, এমনকি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র রায়ের, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান যেহেতু ইসলাম বিরোধী তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়,

বন্দে মাতরম্ এর অঙ্গচ্ছেদের পর প্রথম স্তবক গ্রহণ করতেও বিরোধীতা করেন মুসলিম সাম্প্রদায়িকরা! বর্তমানে বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রারও বিরোধীতা করা হচ্ছে। এভাবেই বাংলার আবহমান ধর্মসংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণের ফল বঙ্গভঙ্গের কারণ হয়েছিল তবে এবার তা বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্কট বলেই মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্ব:

পৃথিবীর কোনও সভ্যতাই ধর্মকে বাদ দিয়ে বিবর্তিত হয়নি, কারণ মানুষের বৌদ্ধিক বিবর্তনটা প্রাথমিকভাবে ধর্মকে ভিত্তি করেই হয়েছে।

ভবানীপ্রসাদ সাহু তাঁর "ধর্মের উৎস সন্ধানে"-র "ধর্মচিন্তার স্তরভাগ " প্রসঙ্গে লিখেছেন - "মানুষ যেভাবে ধর্মচিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে তার স্তরভাগ করলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ দেখা যায়, যেমন - আদিম (primitive), প্রাচীন(archaic), ঐতিহাসিক (historic), প্রাক্ -আধুনিক (early modern) ও আধুনিক (modern)। আধুনিক ধর্ম এখনও পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার পথে, যেটি বিজ্ঞানের তথ্য ও যুক্তিবোধের সঙ্গে উপযোগী হয়ে, মানবিকতার সমস্ত সৎ মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু এটা এখনও সম্ভাবনা মাত্র, কবে কীভাবে হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এবং এই "ধর্ম"

আদিম চিন্তার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হওয়া ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা থেকে বিযুক্ত হয়েই সৃষ্টি হবে, অন্তত ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি তাই। এখনকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস থেকে তা হবে গুণগতভাবে পৃথক। অন্ধবিশ্বাস, অনড় অচল আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি তথা ধর্ম সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত ধারণা থেকেই তা মুক্ত হবে। বাঙালির ধর্মসংস্কৃতির বিবর্তনকে ও তার স্বরূপকে বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাঙালি তার সমৃদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ভুলে আজ নি-

র্বিচারে পরানুকরণ করতে গিয়েই বাঙালি জাতি অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। আজ এই প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠছে – বাঙালি আগে হিন্দু/মুসলমান নাকি বাঙালি, নাকি ভারতীয়/বাংলাদেশী/ আমেরিকান?

আসলে আমাদের আত্মপরিচয়টা বহুমাত্রিক, তাই একাধারে আমি বাঙালি ভারতীয় হিন্দু/ মুসলমান/নাস্তিক সবই হতে পারি।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে হিন্দু-মুসলমান এই জাতীয় আত্মপরিচয় ছিল না, বরং

আমার জাত -উপাসনার সম্প্রদায় -ভাষা-অঞ্চলত্তিক পরিচয়টাই তখন ছিল, ঔপনিবেশিক আমলেই পরবর্তীকালে Pan-Islamic, Pan-Hindu প্রভৃতি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা জনপ্রিয় হয়, এটার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ঐক্য-স্থাপন করা কিন্তু এর ফল হলো মারাত্মক।

এইধরণের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে হিন্দু ও ইসলামের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে একটা কাল্পনিক আদর্শবাদী ধারণার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল, এভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদের জন্ম হয়,

মনে রাখতে হবে ধর্মীয় মৌলবাদ মূলত ঔপনিবেশিকতার ফল।

এর ফলে সাম্প্রদায়িক হিংসার বিশ্বায়ন হল, খিলাফতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুসলমানরা একসঙ্গে আন্দোলন শুরু করল, অথচ তুরস্কের খিলাফত বিরোধী আন্দোলন ছিল এক প্রগতিশীল আধুনিক তুরস্ক গঠনের আন্দোলন। তিতুমীর থেকে মোপলা বিদ্রোহেও স্থানীয় শোষকদের বিরোধীতার সঙ্গে যুক্ত হলো হিন্দু বনাম মুসলমান এই দ্বান্দ্বিক ন্যারেটিভের।

ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙার ফলে বাংলাদেশের ঢাকার হিন্দু মন্দির ভাঙা হল,

ISIS এর জন্য ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের

অনেক মুসলমানরা জেহাদ করতে গিয়েছিল। প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীরের প্রতি অনেক মুসলমানদের একাত্ম অনুভব করাটাও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদই। কারণ জাতীয় হিংসা তো প্রতিটি মহাদেশেই ঘটে চলেছে, সেসবের ক্ষেত্রে তো সর্বাত্মক প্রতিবাদ দেখা যায় না।

অপরদিকে তুরস্কের হায়া সোফিয়া গীর্জাকে মসজিদ বানানো হলে ভারতীয় মুসলমানদের অনেকেই খুশি হয়েছিলেন। কাতারের বিশ্বকাপের সাফল্যে অনেকেই মুসলিম দেশের সাফল্য ভেবে গর্বিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের দুর্গাপূজায় মূর্তি ভাঙা ও পরবর্তী আক্রমণের পরিবর্তে আসাম ত্রিপুরার মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করা হয়।

আফগানিস্তানের তালিবানদের বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি ভাঙার ফলে মায়ানমারের রোহিঙ্গা বাঙালি মুসলিমদের নিজের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হতে হয়।

প্রতিটি ঘটনার কারণ ছিল, কাকতালীয়ভাবে তাঁরা সকলেই বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর সদস্য হওয়াটাই।

এই কারণেই গ্রীস ও তুরস্কের আলাদা হওয়া বা ভারতের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদেরও ফসল হচ্ছে দেশভাগ।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ফলেই “ইসলামের স্বর্ণযুগ”, “হিন্দুদের স্বর্ণযুগ” নামক কাল্পনিক ইতিহাসের সৃষ্টি।

যেখানে হজরত মহম্মদের পূর্ব যুগকে অন্ধকারের যুগ বলে বর্ণনা করা হয়, অথচ সেই যুগই ছিল মহিলাদের স্বাধীনতার যুগ।

এখনও অনেক মুসলমানই ভাবেন তুর্কি ও মুঘল শাসন আসলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের অবদান অথচ তাঁরাই মুসলমানদের হারিয়ে ব্রিটিশদের শাসকে খ্রিষ্টানদের শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে দেখেন না।

প্রাচীন বৈদিক যুগকে হিন্দুত্ববাদীরা ব্যবিলনীয় ও মিশরীয়দের চেয়ে উন্নত ভাবেন।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বা ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের রাজনীতি আজ বর্তমানে বিশ্বশান্তির ও "আধুনিকতা"র প্রধান অন্তরায়।

কারণ আধুনিকতার সাথে যৌক্তিক মানসিকতার সম্পর্ক রয়েছে,

অন্যদিকে আধুনিকীকরণ হচ্ছে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যা কাতার ইরাণ সৌদি আরব বা হিন্দুত্ববাদী ভারত, ইসলামিক বাংলাদেশ পাকিস্তান সবজায়গাতেই হচ্ছে।

আমরা অনেকেই এই আধুনিক বনাম আধুনিকীকরণের তফাৎটা ভুলে যাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্ম ও জাতিসত্তা তো মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আত্মপরিচয়ের জায়গা, এই আইডেন্টিটিগুলো ছাড়াও তো মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব।

হ্যাঁ, তা সম্ভব হলেও, বাঙালির সাংস্কৃতিক সম্পদ শুধুই বাঙালির নয় বরং তা সমগ্র মানবতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, কারণ প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে মানুষের বৈশ্বিক সংস্কৃতিতে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিটি জাতির পরিচয়ের অংশ।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের অতীত ও বর্তমানের সমাজবি-কাশের সূত্র দেয়।

সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদে বিশ্বাস করলে, আমাদের প্রত্যেকের দায় আছে

নিজের সংস্কৃতি রক্ষা করার, অপর সংস্কৃতির সাথে যোগাযো-গের মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ করা, তবে তা নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন নয় বরং যা কিছু যুক্তিহীন অপসংস্কৃতি রয়েছে তার বর্জনের সঙ্গে অন্যের সুসংস্কৃতির কোনও উপাদানকে গ্রহণের মাধ্য-মেই সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব হয়।

এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে বাঙালির রন্ধনসংস্কৃতি, যা তুর্কি মুঘল থেকে ইউরোপীয়, সকলের অবদানে সমৃদ্ধ বাঙালির রন্ধনসংস্কৃতি।

পুঁজিবাদ বনাম সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের যুগে "বিশ্বায়ন" ও

"আন্তর্জাতিকতাবাদ এই দুটি শব্দের উদ্ভব হয়।

পুঁজিবাদের প্রাধান্যের কারণেই "বিশ্বায়ন" শব্দটি খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-কে আত্মপরিচয়কে উপেক্ষা করা।

তাই আমার পছন্দ আন্তর্জাতিকতাবাদ, যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ।

এতে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা হয়নি অথচ মানবসভ্যতার বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জাতির পরস্প-রের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানকেও গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়েছে।

তাই আমি বিশ্বায়নের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতাবাদকেই বেশি গ্রহণযোগ্য ভাবনা বলে মনে করি।

প্রতিটি জাতির বিকাশ হলেই আন্তর্জাতিকতাবাদেরও বিকাশ সম্ভব, তাই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে কখনওই সুস্থ সুন্দর সম্প্রীতিময় মানবজাতির ভবিষ্যত সম্ভব হবে না।

তৃতীয় পর্ব:

প্রাচীন বাংলার ধূসর ইতিহাসের কালপর্বে রাজনৈতিক শক্তির অভাবেই সম্ভবত " বৃহৎ বঙ্গদেশ"-এর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই সাংস্কৃতিক ঐক্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। "বঙ্গ" শব্দটি প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও দেশবাচক শব্দ ছিল না, ছিল জনবাচক (tribe)।

আজকের এই "বৃহত্তর বাংলার" ভৌগলিক পরিসরে বিভিন্ন জনপদের নাম পাওয়া যায়। বঙ্গ -পুন্ড্র-রাঢ়-গৌড় এসবই ছিল একসময় কোম বা জনপদ-রাষ্ট্র। পরবর্তীকালে রাঢ়-বঙ্গ-গৌড়-বরেন্দ্র-পুন্ড্র-বঙ্গ-সমতট-হরিকেল প্রভৃতি খন্ড-খন্ড জনপদ নিয়ে বাঙালির ভৌগলিক পরিচয় গড়ে ওঠে। যা মুঘল আমলে "সুবে বঙ্গাল" থেকে ঔপনিবেশিক আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তে পরিণত হয়।

তবে বিশেষ ভূপ্রকৃতিগত সীমার মধ্যেই জাতি ও ভাষাগত

ঐক্য গড়ে উঠলেও দেশ গঠন হয় তার রাজনৈতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী। তাই বর্তমানে বাঙালি অধ্যুষিত ভূমি বলতে পশ্চি-মবঙ্গ,বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ছাড়াও বিহার ঝাড়খন্ড আসামের কিছু অংশও রয়েছে।

বাঙালির অখন্ড জাতি-চেতনার উদ্ভব উনিশ শতকে হলেও তা অনেকটাই কৃত্রিম ও বায়বীয় ছিল। পরবর্তীকালে রাজ-নৈতিক কারণেই হিন্দু-মুসলিম ও দলিত বাঙালির আত্মপ্র-কাশ ঘটে। এরফলস্বরূপ দেশভাগটাই ভবিতব্য হয়ে ওঠে।

আজ বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই অখন্ড বাঙালি জাতি-চেতনার বিকাশ প্রয়োজন, এবং এই কারণেই বাঙালির, বাঙালি -জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাসটা জানা দরকার।

এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু ধর্মসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করাই, তাই বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সামাজিক রাজনৈ-তিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনটা নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব।

জৈবিক নৃবিজ্ঞান ও আধুনিক জিনতত্ত্ববিদদের মতে অতীতে বাংলায় মোট পাঁচটি পরিযান হয়েছিল - যা সারা পৃথিবীতেই এক বিরলতম ঘটনা। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিকভাবেও এই পাঁচটি জাতির মিলনে বাঙালির উদ্ভব। আজকাল যদিও শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে জাতিগত পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই সাংস্কৃতিকভাবেও যে বাঙালি একটি সংকর জাতি তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় — প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্ব (ethnology)।

অন্যদিকে সংস্কৃতির প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে - ভাষা ও ধর্ম।

বাংলাভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রেও পাঁচটি পূর্বোক্ত পরিযানকারী জাতির প্রভাব থাকবে।

তবে আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলা ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি ধারাকেই উল্লেখ করব - প্রথমটি অনার্য ধারা, যার

মধ্যে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীগুলি রয়েছে

এবং দ্বিতীয়টি ও প্রধান ধারাটি হচ্ছে –

আর্যভাষার ধারা যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষানদীর একটি ধারা থেকেই মাগধী প্রাকৃত হয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো –ধর্ম।

যা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রচলিত ধর্মমতগুলির তিনটি দিক রয়েছে, বিশ্বাস (belief) অনুষ্ঠানাদি (worship) ও সংগঠন (organization), এই বিশ্বাসের ধারাটি সৃষ্টি ও সংঘবদ্ধ হয়েছে পুরা-প্রস্তরযুগেই, অর্থাৎ বাঙালির ধর্মভাবনার উৎসও সেই প্রস্তরযুগেই।

তবে বাঙালির ধর্মসংস্কৃতির বিবর্তনটা জানতে হলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবটাও আগে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

ষোড়শ মহাজনপদের একটিও বাংলায় না থাকায় এবং বৈদিক সাহিত্যে তেমন বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকায় অনেকেই বাংলাকে অনার্য অধ্যুষিত ভূমি হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু উয়ারী-বটেশ্বর থেকে মহাস্থানগড় এবং Northern black polished ware pottery –র নিদর্শন থেকেই বোঝা যায়, বাংলায় আর্যদের আগমন আড়াই হাজার বছর আগেই হয়েছিল।

মহাভারতের সভাপর্বের "দিগ্বিজয়পর্বে" উল্লেখ রয়েছে – পঞ্চপান্ডবরা বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে জয়লাভ করেন, সেখানে ভীম তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গদেশ জয় করেন, আমরা জানি তাম্রলিপ্ত একটি প্রাচীন রাজ্য এবং লক্ষ্যণীয় যেটা তা হলো আজও মেদিনীপুরে ভীমের পূজা বিশেষভাবে হয়। গগনেডাঙায় কথিত আছে এখানে ভীম-বকাসুরের নাকি যুদ্ধ হয়েছিল।

তবে বাঙালি জাতির আর্যায়ন মৌর্য যুগ থেকেই শুরু হয়ে যায় এবং এর ধারাবাহিকতা গুপ্ত যুগ পর্যন্ত চলে।

আর্য ধর্মসংস্কৃতির দুটি ধারা রয়েছে, একটি বৈদিক অপরটি অবৈদিক।

বৈদিক আর্যসংস্কৃতি ছিল মূর্তিপূজাহীন যাগযজ্ঞময়, এই বৈদিক সংস্কৃতির ধারাটি হয়ত

বাংলায় জনসমর্থন পায়নি, এবং কালক্রমে এই বৈদিক ধর্ম থেকেই classical hinduism এর উদ্ভব হয়।

যা বাংলায় শুঙ্গ থেকেই গুপ্তযুগের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং সেনযুগে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

অন্যদিকে অবৈদিক ধর্মগুলোর মধ্যে প্রথমের দিকে জৈন ও আজীবিকরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তাই জৈন ও আজীবিকদের বাংলার আদিধর্ম বলে বর্ণনা করা যায়। পরবর্তীকালে আজী-বিকরা স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে জৈনদের মধ্যেই মিশে যায়। বর্দ্ধমান জেলার নাম তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীরের নামেই হয়েছে,

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেও জৈনদের প্রভাব বিশেষভাবে ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মও একই সময়ে বাংলায় এলেও ঐ দুই ধর্মের কারণেই অনেক পরে বাংলায় বৌদ্ধদের প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধ-র্মে বঙ্গদেশ প্লাবিত হলেও জৈনরাই কিন্তু বঙ্গভূমির সন্ধান জানতেন বেশি।

জৈনভগবতী সূত্রে – অঙ্গ বঙ্গ এবং রাঢ়ের উল্লেখ রয়েছে।

জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের মাধ্যমেই আর্যভাষা ও আর্যসংস্কৃ-তির সঙ্গে বাংলার তৎকালীন অধিবাসীদের পরিচয় হয়।

এভাবেই গুপ্তযুগে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়।

তবে রাজনৈতিকভাবে বাঙালির উত্থান হয় রাজা শশাঙ্কের মাধ্যমেই, যেহেতু হর্ষবর্ধনের পরম শত্রু ছিলেন শশাঙ্ক, তাই শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিরোধী বলে অপপ্রচার করা হয়েছিল, এবং হিউয়েন সাং তাঁকে বৌদ্ধবিরোধী বলে উল্লেখ করলেও শশা-ঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে যে দশটি বৌদ্ধবিহার ও দুহাজার হীনযান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, রক্তমৃত্তিকা নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দিরও ছিল তার উল্লেখও করেন।

তাই শশাঙ্ককে একজন পরমতসহিষ্ণু ও প্রজাপালক রাজা হিসেবেই বলা উচিৎ।

এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য দখল করলেও, শশাঙ্কের সময় থেকে পালযুগ পর্যন্ত সর্বধর্মসমন্বয়ের রাষ্ট্র নীতিই রাজারা অনুসরণ করতেন।

এই সময় থেকেই বাংলা বাণিজ্যসূত্রে বহির্ভারতের সাথে যুক্ত হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের কারণেই তাম্রলিপ্ত সেই সময় আন্তর্জাতিক বন্দর হয়ে ওঠে। বাঙালি স্থপতি শিল্পী ও কারিগরদের সুনাম ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে,

তবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব পালযুগের পরই বৃদ্ধি পায়,কারণ পাল আমলের সব রচনাই ছিল, সংস্কৃত।

অথচ এই সময়ই চোল শাসকরা শ্রীলঙ্কায় বঙ্গলিপিতে মুদ্রা জারি করেন।

সেন শাসনামলেই বঙ্গলিপি প্রথম স্বীকৃতি পায় এবং ইলিয়াস শাহী আমল থেকে বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে।

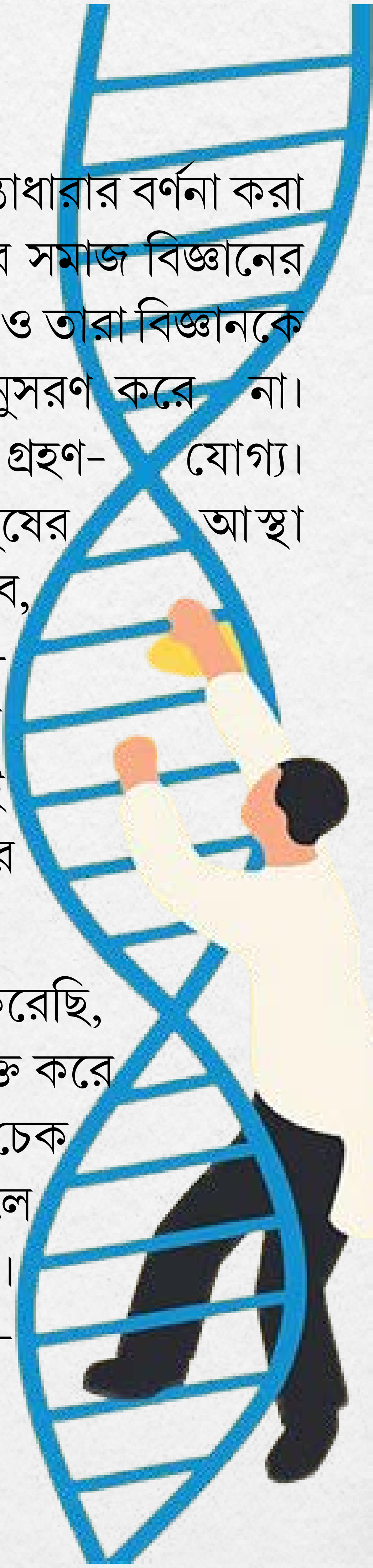
যদিও অনেকেই সেন আমলকে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান হিসেবেই বর্ণনা করেছেন, আমার ধারণা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এটাও প্রণিধানযোগ্য, যে “বাংলার মনু” রঘুনন্দন কিন্তু ১৫শ - ১৬শ শতকের লোক ছিলেন।

জয়দেবও সেনযুগের কবি যাঁর সময়ই বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে গ্রহণ করা হয়।

সূচিপত্র

বিজ্ঞান কী

লিখেছেন – কোয়েস আলি



বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও আমদের সমাজ

(সহজ ভাষায় বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বর্ণনা করা খুব সহজ কাজ নয়। বর্তমান সময়ে মানব সমাজ বিজ্ঞানের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কিন্তু এরপরেও তারা বিজ্ঞানকে স্বীকার করে না, বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে অনুসরণ করে না। বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্ম তাদের কাছে অধিক গ্রহণ-যোগ্য। বিজ্ঞানীদের চেয়ে ধর্মীয় নেতার ওপরে মানুষের আস্থা বেশী। এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধে চেষ্টা করব, সহজ ভাষায় বিজ্ঞান ও মানব সমাজের পরি-বর্তনকে একই সূতায় গাঁথতে। কেন মানুষ বিজ্ঞানকে নিয়ে দ্বিধাদন্দ্বে ভোগে, কেনই বা সে অলৌকিক বিষয় আঁকড়ে ধরে, এর প্রতিকার কি? এসবই হবে আলোচ্য।

লেখার জন্য আমি বেশ কিছু বই ব্যবহার করেছি, সেগুলোর রেফারেন্স লেখার শেষে সংযুক্ত করে দিচ্ছি। আগ্রহী পাঠকগণ সেসব রেফারেন্স চেক করবেন এবং নতুন চিন্তাভাবনা থাকলে সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেবেন। বোঝার সুবিধার জন্য চেষ্টা করেছি, সাধা-রণভাবে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে লিখতে।)

একটু অপ্রাসংগিক গল্প:

একটু জ্ঞান দিয়ে নিই! প্রায় সাড়ে তের বিলিয়ন বছর আগে যখন সময়, পদার্থ আর এনার্জি তৈরি হল, তখন থেকেই আমাদের মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হল। পৃথিবী সৃষ্টি হল আরও প্রায় ৮ বিলিয়ন বছর পর। আর তারও ২ বিলিয়ন বছর পর প্রাণ নামক এক বস্তুর। আর এরপর বিবর্তনের ধারায় মানুষ এল মাত্র ২.৫ মিলিয়ন বছর আগে। মাত্র ৫ লাখ বছর আগে নিয়েন্ডারথালরা এল। স্যাপিয়েন্স(মানে আমরা) ধুলো মলিন পৃথিবীতে এলাম মাত্র ২ লাখ বছর আগে। এরপর সময়ের সাথে সাথে আমরা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে থাকলাম। এই স্যাপিয়েন্সদের মস্তিষ্কের বিকাশটা হল খুব ভালভাবে। আগুনে ঝলসানো সুস্বাদু খাবার খেয়ে হজম করা ছিল সহজ, তাই তাদের পেটের নাড়ি ভূড়ির দৈর্ঘ্য কমে গেল, রক্তে থাকা পুষ্টি উপাদান মস্তিষ্কে বেশী শক্তির যোগান দিতে থাকল। ব্রেনের নিউরণগুলো পরিপুষ্ট হবার সাথে সাথে পরি-বেশের সাথে স্যাপিয়েন্সদের খাপ খাইয়ে নেয়াটা বেশ সহজ হল। তাদের মাঝে চিন্তা করার ক্ষমতাটা বাড়তে থাকল। এমনকি, যা তাদের চারপাশে নেই, সেসব বিষয়ও তারা ভেবে নিইয়ে কাজ করতে থাকল, গল্প বানাতে শুরু করল এবং নিত্যনতুন উপায়ে প্রতিদিনের সমস্যাগুলোর সমাধান বের করতে লাগল! কোন সমস্যার সমাধান করার আগে সেটাকে ভালভাবে বুঝতে হত, একবারে সমাধান না করতে পারলেও নতুন নতুন পদ্ধতি ভাবতে হত। এজন্য, মানুষের দরকার হল তার চারপাশের পরিবেশকে বোঝার চেষ্টা করা। বলতে পারেন, শুরু হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক চিন্তার শুরু, যা আজ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভবে চলছে!

এরপর স্যাপিয়েন্সরা কৃষিকাজ করা আয়ত্বে নিয়ে নিল। ফলে তাদের আর যাযাবর জীবনযাপন করতে হল না। স্থায়ী আবাস তৈরি করে, অনেক সহজে খাবার জোগাড় করা গেল। সভ্যতার বিকাশ শুরু হল এইভাবেই। এই ছোট সমাজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। বড় বড় নগর বন্দরও তৈরি হল ভাষার বিবর্তন হল, লেখ্যরূপ তৈরি হল। আবিষ্কার করা জ্ঞা-নগুলো পরের প্রজন্মের জন্য লিখে রাখা শুরু হল অত্যন্ত

কার্যকরভাবে। নতুন প্রজন্ম সেগুলোতেই থেমে থাকল না, এরচেয়ে ভাল উপায় বের করতে পারলেই তারা সেসব ব্যবহার করতে শুরু করল (সহজ জীবন কিন্তু আস্তে আস্তে জটিল হয়ে গেল)। স্যাপিয়েন্সরা কিন্তু এরই মাঝে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। ফলে চারপাশের পরিবেশ বদলে গেছে। বিভিন্ন স্থানের মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে থাকতে জ্ঞানের বিকাশটাও হল ভিন্নভাবে। সাথে সাথে সেসব না বোঝা গেলেও, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেসব ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে গেল। যেসব জায়গায় ফসল ফলাতে কষ্ট হত, সেসব জায়গায় মানিয়ে নেয়ার চেষ্টাটাও বেশী করতে হত। ফলে, তাদের কৌশল হত বেশ খানিকটা চৌকশ। কোথাও হয়ত সহজেই ফসল হত, ফলে তাদের গপ্পো করার সময় হত বেশী। সেসব জায়গায় মানুষের কৃষিকাজের কৌশল হয়ত অতটা জটিল ও শ্রমসাধ্য হত না। কৃষিকাজের জন্য আর বেঁচে থাকার জন্য পানি দরকার হত। পানির উৎস তৈরির জন্য শুরু হল সে কি প্রানান্ত চেষ্টা! প্রতিদিনের এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শুরু হল মানবসভ্যতার।

সে যাইহোক, মোটের উপর পৃথিবীর নানান প্রান্তেবিচিত্র রকমের সভ্যতার জন্ম হল। শুরু হল নতুন যুগের। শরীরের বাইরেও শুরু হল আরেক বিবর্তন! সমাজের বিবর্তন, গল্প তৈরি করায় বিবর্তন!

বিজ্ঞানের শুরু: প্রাচীন থেকে আধুনিকযুগ

প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি, এক পরিচ্ছদে এই গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু দিচ্ছি না, তাই প্রশ্ন মনে আসলেই নোট করে ফেলুন। লেখার শেষে রেফারেন্স পেয়েই যাবেন, সেখানে গিয়ে একটু দেখে নেবেন।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার জন্ম হয়েছিল মানুষ লেখা শিখবার আগেই। প্রাচীন গুহাচিত্র দেখে বোঝা যায়, মানুষ ঋতুপরিব-

র্তনের বিষয়টা জানত। বলতে পারেন, দিন এবং রাত কিভাবে হয়, সেটা নিয়ে গল্প বানানো সহজ ছিল, কিন্তু বছর ঘুরে ঘুরে ঋতু পরিবর্তনের বিষয়টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর উপরে মানুষের খাবারের জোগান নির্ভর করত। কোন পশুর আবাসস্থল কোথায় হবে কিংবা কখন তারা চারণভূমীর জন্য কোথায় যাবে, অথবা কোন ফসল কোন ঋতুতে ভাল জন্মে- এসব ছিল প্রাথমিক পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান তাই মানুষের লিখিত ইতিহাসের চেয়েও পুরোন। প্রাচীন বিজ্ঞান ছিল এসব প্রাকৃতিক বিষয় পর্যবেক্ষণ এবং তাকে ব্যবহার করে প্রতিদি-নের সমস্যার সমাধান। পর্যবেক্ষণ মানে শুধু দেখা নয়, শোনা, চোখে দেখা, স্পর্শের মাধ্যমে বোঝা-এসবও যুক্ত করতে হবে। আধুনিক কালে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ কিংবা গাইগার কাউন্টার আমাদের উপলব্ধির সীমাকে বাড়িয়েছে মাত্র।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রেট ব্রিটেনে পাথরের বাড়িঘরগুলো প্রমাণ করে, তারা জ্যামিতি সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখত। পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রমাণিত হবার প্রায় ২০০০ বছর আগে সেই প্রাচীন মানুষ গুলো কি করে সেই মূলনীতি ব্যবহার করতে পারল, তা সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। এসব যে শুধু বসবাসের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তাই নয়। প্রাচীনযুগের এসব মেগা স্ট্রাকচার তৈরি হত নানা সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে। গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে মানুষ বেহেশত/স্বর্গ খুজে বেড়াত। বলা যায়, এ জাতীয় অলৌকিক গল্পকে প্রমাণ করতে গিয়েই শুরু হয় চারপাশের উপলব্ধিজগতের বিশ্লেষণ। তাই বলা যায়, প্রকৃতির নিয়মকে জানার জন্যই বিজ্ঞানের জন্ম হয়। এটাই ছিল প্রাচীন বিজ্ঞান। বর্তমানে সেই বিজ্ঞান জটিল থেকে জটিলতরই হয়েছে মাত্র। সুতরাং বলা যায়, প্রাচীনতম বিজ্ঞান হল জোতির্বিজ্ঞান।

প্রাচীন চৈনিক সভ্যতায়, উপলব্ধিযোগ্য সবকিছুর বিশ্লেষণ করা হত বেশ ভালভাবে। ওরা আকাশের তারার মাঝে শুধু অলীক গল্প খুঁজে ফেরেনি। বরং বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করাই বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে বিকশিত মিশরীয়

সভ্যতা ছিল পুরোপুরিই ধর্ম কেন্দ্রিক। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার সভ্যতায় বাস্তব জ্ঞানের চর্চাটা বেশ বেশী ছিল। বলা যায়, কঠোর প্রকৃতিতে টিকে থাকবার জন্যই তারা বাস্তব সমস্যা সমাধানে বেশী মনযোগি ছিল। ঠিক (এই কঠিন প্রকৃতির প্রভাবেই চৈনিক সভ্যতা ছিল বেশী বাস্তবতা কেন্দ্রিক। বরং ভারতীয় সভ্যতা ছিল ধর্মীয় রীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। তাই আমরা যখন বিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে তাকাই, দেখতে পাব যে ধর্ম কেন্দ্রিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের বিবর্তন বেশ ধীর। প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের বিপুল জ্ঞান ও সম্পদকে পরকাল নিশ্চিত করতে ব্যয় করেছিল, একই কাজ হয়েছিল ভারতে, আমেরিকায়।)

বিজ্ঞানের জগতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে গ্রীক সভ্যতার বিকাশে। গ্রীক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এমন এক জায়গায় যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাপ্যতা ছিল চোখে পড়ার মত। মূলত: গ্রীক বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের হাতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারারর সূচনা হয়। গ্রীক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতেই হবে। এছাড়া বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বোঝা সম্ভব না। প্রথমত, প্রায় সব সভ্যতাই যখন ধর্মের কাছে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন গ্রীকরা যুক্তি তথ্য নির্ভর বিশ্লেষণে বেশী জোর দিয়েছিল। তারা প্রকৃতিকে একটি নিয়মবদ্ধ কাঠামো হিসাবে ধরে নিয়মগুলোকে বের করতে চেয়েছিল। ফলে চৈনিক ও মেসোপটেমিয়ার ব্যবহারিক গণিত নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করল। বাস্তবতা বেশী গুরুত্ব পেল, ধর্ম তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেল। ধারণা করা হয়, গ্রীকদের ধর্ম বিষয়ে এই কম গুরুত্ব দেয়াটাই তাদের যুক্তি এবং তর্কের মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে মূল প্রভাবক হিসাবে কাজ করল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ শতকে থেলস এই ধারণাকে ভিত্তি করেই দর্শনের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে কয়েকশতক ধরে গ্রীকরা শুধু দর্শন চর্চাই করেনি, বরং বিজ্ঞান ও গণিতের ভিত্তিটা আরও মজবুত করে গেল। টলেমি, পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, এরিস্টটল রা নতুন ধারণার চর্চাটা আরও সূক্ষ করে তোলেন। আর্কিমিডিস পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে গণিতের

যোগসূত্র তৈরি করার পিছনে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। সেই গল্পগুলো অন্য আরেকদিন বলা যাবে।

দুঃখের বিষয়, গ্রীক সভ্যতার পতনের সাথে সাথে এই চর্চাটাও কেন যে ঝিমিয়ে গেল। রোমানরা ছিল অতিমাত্রায় প্র্যাকটি-ক্যাল। ফলে তারা নতুন চিন্তা করার বদলে পুরোন ধ্যানধার-ণার ব্যবহারিক কার্যে গ্রীক বিজ্ঞানীদের এই জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীতে ১৫০০ শতক পর্যন্ত মূলত বিজ্ঞানের কোন যুগান্তকারী ঘটনা ছিলই না। এই মধ্যের সময় খ্রীষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে দুটি সভ্যতা তৈরি হয়। দুই ধর্মই ছিল অত্যন্ত সুগঠিত, রাজনীতি যুক্ত এবং অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান। ইসলামিক শাসনামলের জ্ঞানী ব্যক্তিরা গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুবাদ করতে বিন্দুমাত্র দেরী করেনি। ১০৬৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে খ্রীষ্টানরা সেই রকম ভাবে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের কিছুই প্রায় নিতে পারেনি। ১০৬৫ সালে টলেডো নগরী খ্রীষ্টানদের হাতে আসা মাত্র তারা সেই অমৃতের সন্ধান পায়। কারণ, স্পেনের টলেডো শহরেই ইস-লামিক শাসনামলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরীটি ছিল। মূলতঃ এরপরে দুই প্রধান প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক ধর্ম সমানে সমানে টক্কর দিতে থাকল। এসময় বহু বিজ্ঞানী,গণিতবিদের কাজ উল্লেখযোগ্য ছিল, কিন্তু সেই জ্ঞানগুলো ছিল সেই গ্রীক জ্ঞানভান্ডারের উপর ভিত্তি করে করা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কোন যুগান্তকারী আইডিয়া আমরা পাই না। বলা যায়, বিজ্ঞা-নের নয়, উন্নতি হয়েছিল প্রযুক্তির। গণিতের জটিলতা গুলো শুধুই পরিমাপ করার স্বার্থে তৈরি হল, নতুন নতুন ধারণার কোন দিক নির্দেশনা সেখানে ছিল না। বলা যায়, এই সময়-টাইয় বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্ম দিতে স্যাপিয়েন্স প্রজাতি ব্যার্থ হল, তারা যুদ্ধ, অর্থনীতি, রাজনীতিতে ব্যস্ত হল বেশী। যদিও এসময় মধ্যপ্রাচ্যে বহু জ্ঞানী মানুষ জন্মেছিলেন। ইবনে সীনা, খোয়ারিজমি কিংবা আল রাজী উল্লেখযোগ্য নাম।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর পরে শুরু হল এক বিপ্লবের। এমন বিপ্লব স্যাপিয়েন্সের ইতিহাসে আর কখনওই ঘটেনি।

গ্রীক দর্শনের প্রভাবে তখন তরুণ চিন্তাবিদদের হতাশা কেটে যেতে শুরু হয়েছে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপর। শুরুটা করলেন কোপার্নিকাস। সৌরজগতের প্রচলিত মডেল নিয়েই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, এটি নিখুঁত নয় বলে ধারণা ছড়ালেন। টাইকো ব্রাহে, গ্যালিলিও আর কেপলার সেই পালে দিলেন বিপুল হাওয়া। গ্যালিলিও প্রবর্তন করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে যাচাই করার কাজটির। এই পরীক্ষা করে দেখার কাজটি আগে করা হতো না। এরিস্টটল ভাবতেন, পরীক্ষা করার মানে প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে যাওয়া, আর তাতে সত্য বের হবে না। গ্যালিলিও সে ধারণা বদলে দিলেন। এমনকি চার্চের কঠোর শাসনও এই আগুনকে থামাতে ব্যার্থ হল। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা কিংবা গ্যালিলিওকে গৃহবন্দি করা একদমই কাজ করল না। সবচেয়ে যুগান্তকারী ধাক্কাটা দিলেন নিউটন, গণিতবিদের দক্ষতায় পদার্থবিজ্ঞান ও জোতির্বিজ্ঞানকে অনস্বীকার্য করে তুললেন। আপনারা কেউ ভেবে বসবেন না, এটা এককভাবে কয়েকজন বিজ্ঞানী দিয়ে হয়েছে। অসংখ্য বিজ্ঞানীদের তিল তিল করে গড়ে তোলা ধারণা, সেগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং সেই সাথে তাদের মাঝে বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগের উন্নতির কারণেই এই বিপ্লব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। রেনে দেকার্ত, লাইবনিজ, স্পিনোজার মত চিন্তাবিদেরা বিজ্ঞান, দর্শন ও গণিতকে একসাথে ব্যবহারের চেষ্টা করলেন। নিউটন মহাবিশ্বের যে ধারণাটা দিতে পেরেছিলেন, তাতে মানুষের দীর্ঘদিনের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। শুধু ব্যক্তি নিউটনের মেধার জোরেই সেটা সম্ভব হল, এধারণাটা কিন্তু সঠিক না।

একটা কথা না বললেই না, সেটা হল প্রযুক্তিবিদদের কথা। দ্য ভিঞ্চির মত অনেক অনেক প্রতিভাধর প্রযুক্তিবিদদের কারণে বিজ্ঞানের আলাদা অবস্থা তৈরি হতে পেরেছিল, সেটা অস্বীকার করা হবে বড় ভুল। পরবর্তীতে রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের রেনেসাঁ কিন্তু প্রযুক্তির উপর ভর করেই হয়েছিল এবং হচ্ছে।

বিজ্ঞান নাকি ধর্ম যুদ্ধ, নাকি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা

অস্বীকার করার উপায় নেই, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ধারণা হল সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর/আল্লাহ/ভগবান সম্পর্কিত ধ্যান ধারণাগুলো। দীর্ঘদিন মানুষ কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করে নিয়েছে, যে সৃষ্টিকর্তা আছে। প্রাচীন কালের সাধারণ পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞান থেকে শুরু করে গত শতক পর্যন্ত এর প্রবল প্রতিপত্তি বিজ্ঞানের জগতকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের তৈরি মহাবিশ্বকে নিখুঁত মনে করেই মহাবিশ্বকে নিখুঁত করতে চাইতেন। সেপর্যন্ত ধর্ম ও বিজ্ঞান পাশাপাশিই চলেছে। ধর্ম, রাজনীতি কিংবা সামাজিক রীতিনীতির সাথে বাস্তবের মিল খুঁজে দেখার মত অবস্থায় বিজ্ঞান বেশীদিন আগেও ছিল না। দার্শনিকরা এবিষয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু অবস্থার সত্যিকারের পরিবর্তন হয়েছিল তখনই, যখন কোপার্নিকাস খুব ভয়ে ভয়ে তার কালজয়ী ধারণাটি সামনে আনলেন। ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক।

খ্রীষ্ট ধর্ম তখন পৃথিবীর অন্যতম প্রভাবশালী ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব কিংবা শাসন কাজের সুবিধার জন্য নিখুঁত ভাবে ক্যালেন্ডার তৈরি করা ছিল সে সময়ের খুব জরুরী বিষয়। ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য ঋতুর আবর্তন বুঝতে হত। জোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের চুলচেরা বিশ্লেষণ এজন্যই জরুরী ছিল। কিন্তু সেসময় চার্চের দাবী ছিল, ঈশ্বর পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সব তৈরি করেছেন। এর আগে টলেমি, এরিস্টটলও সেরকম ধারণা দিয়েছিলেন, সেটাই এদ্দিন চলে আসছিল। কিন্তু জোতির্বিজ্ঞানীরা এবিষয়টাকে কিছুতেই নিখুঁত করতে পারছিলেন না। ভীষণ রকমের জটিল মডেল দিয়েও বিষয়টা মানা যাচ্ছিল না। কোপার্নিকাস দেখলেন, পৃথিবীর বদলে সূর্যকে কেন্দ্রে বসালেই পুরো বিষয়টা সরল হয়ে যায়, ঝামেলাও থাকে না! যদিও কোপার্নিকাস জীবিত থাকতে এই তত্ত্ব চার্চ গ্রহণ করেনি, তাই একই রকম কথা বলে গ্যালিলিও চার্চের দেয়া শাস্তির মুখোমুখি হলেন। চার্চের

সাথে বিজ্ঞানের বিভাজন শুরু হল। এর মাঝে জিওর্দিনো ব্রুনো নামের এক জ্যোতির্বিদ তো বলেই বসলেন, আকাশের মিট-মিট করা তারাগুলো আসলে নক্ষত্র মাত্র, স্বর্গের কিছু নয়। চার্চ খেপে গিয়ে ব্রুনোর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার দন্ড দেয়।

মূলত, ১৮ শতাব্দির পদার্থবিজ্ঞান ধর্মকে অস্বীকার করার চেষ্টাই করেনি। বরং পাশাপাশি চলে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু ১৮ এবং ১৯ শতকে বিজ্ঞানের একের পর এক যুগান্তকারী আবিস্কার প্রচলিত ধর্মের অসাড়তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর বড় আঘাত ছিল। আদম-হাওয়ার গল্প যে সত্যি হতে পারে না, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ যখন নিজের নিরাপত্তাকে প্রকৃতির হাত থেকে নিজের ইচ্ছার মধ্যে এনে ফেলল, ঈশ্বর/আল্লা/ভগবানের দরকারটাও শেষ হয়ে গেল।

(পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও এটা বোঝা যায়। যেসব দেশে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে থাকে, সেসব দেশে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ধর্মান্ধতা বেশী)

বিজ্ঞানের দরকার কেন? সামাজিক বিপ্লবই বা কেন জরুরী?

সহজ ভাষায় বললে, বিজ্ঞান হল আমাদের চারপাশকে জানার উপায়। স্যাপিয়েন্সরা এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে, শুধু এই কারণে, যে সে চারপাশের পৃথিবীকে বুঝতে চেয়েছে, সামনে আসা সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। স্যাপিয়েন্সরা নিয়েন্ডারথালদের হারিয়ে দিতে পেরেছিল শুধুমাত্র এই কারণে, যে তারা একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার পদ্ধতিতে এগিয়ে গেছিল। উপলব্ধিসীমার বাইরে কল্পনা করতে শিখেছিল এবং সেই জ্ঞানগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছাতে পেরেছিল।

সভ্যতার বিবর্তন কিন্তু বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরে আটকে নেই। সামাজিক বিপ্লবের কারণেই আজকে আমরা তুলনামূ-লক নিরাপদে বাস করতে পারি। প্রাচীনকালে মানুষ সাধারণ রোগেই মরে যেত। ১০০ বছর আগেই সাধারণ ইনফেকশ-নের কারণে লক্ষ কোটি মানুষ মারা যেত। ১৯২৮ সালে স্যার আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং এন্টিবায়োটিক আবিস্কার করে কত মানুষের প্রাণ বাচিয়েছেন, ভাবা যায়? বিজ্ঞান আমাদের বেচে থাকার জন্য দরকার, প্রতিদিনের সমস্যাগুলোকে সমাধান করার জন্য বিজ্ঞান, গণিত চর্চার বিকল্প নেই। আর এই বৈজ্ঞা-নিক চিন্তার বিকাশ একদিনে হয় না, সমাজের প্রতিটা অংশ, প্রথা ও আচার এধরণের চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায়। তাই, সমাজে যুক্তির চর্চার প্রসার না হলে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ অসম্ভব। আর তাতে আমাদেরই ক্ষতি। এবিষয়ে বিস্তারিত-ভাবে আরেকটি আলোচনা করা যাবে।

কোনটা নেব – ধর্ম বিশ্বাস নাকি বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা? এদের পার্থক্যই বা কি?

ধর্ম হল এক ধরণের বিশ্বাস। যখন কোন সমস্যার যুক্তি দিয়ে তল পাওয়া যায় না, তখনই মানুষ তার কল্পনার কাছে আশ্রয় খুজে নিয়েছে। কল্পনার সাহায্যে সে তার মৃত্যুভয়-কে দূর করতে চেয়েছে এই বলে, যে মৃত্যুর পরেও অনন্ত জীবন আছে। একটি সমাজের সংস্কৃতিগুলো অবশ্য পালনীয় হয়েছে, মূলত ক্ষতির হাত থেকে বাচতে। তাই, প্রার্থনা করে মানুষ একধরণের শান্তি পায়।

অন্যদিকে, বিজ্ঞান হল কঠোর বাস্তব। যা হয়, হবে, সেসব প্রার্থনা দিয়ে বদলানো যায় না। প্রার্থনা করা আর না করায় ফলাফলের পরিবর্তন আসে না, খুব সাবধানে পর্যবেক্ষ-ণের মাধ্যমে সেটা জনা যায়। ১০ তলা ভবনের ছাদ থেকে কেউ যদি লাফিয়ে পড়ে, সম্ভাবনা কি মারা যাবার বেশী নাকি বাঁচার? প্রতিটি ফলাফলের পিছনেই কোন না কোন কারণ কাজ করে, সেই কারণগুলো জানতে পারলেই ক্ষয়ক্ষতির

পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব।

কোনটা গ্রহন করবেন, সে একান্তই আপনার ব্যাপার। শুধু এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়, সম্ভাবনা যেদিকে বেশী সেদিকে যাওয়াই কি ভাল নয়?

ধর্মের দেয়া শান্তি আসলে একধরণের ইল্যুসন। আপনার সমস্যার সমাধান কিন্তু হয়নি! তাই আপনি আবার কাজটা ঠিক করে করার চেষ্টা করবেন নাকি অলীক শান্তি ভাব নিয়ে পরকালের চিন্তা করবেন, তা আপনিই ঠিক করে নিন।

কিছু ছবি:

তথ্যসূত্রঃ

1. https://www.britannica.com/science/history-of-science
2. The short history of science-or the long path to the union of metaphysics & empiricism: Tumo Suntola
3. The scientific revolution: Steven Shapin
4. Sapiens. Abrief history of Humankind: Yuval Noah Harari
5. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_religion

সূচিপত্র

সংগঠিত ধর্ম কোনওদিন ডারউইনকে পছন্দ করেনি

লিখেছেন – শম্ভুনাথ চার্বাক



জীব সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে? জীবকে সৃষ্টি করেছে কে? এই প্রশ্ন মানুষের মনে নিরন্তর ঝড় তুলেছে সভ্যতার বিকাশের শুরুর সময় থেকেই বড় বড় বিশ্বমানবরাও দ্বি-ধাগ্রস্ত এই ব্যাপারে। ছোটবেলা থেকেই উঠতে বসতে ঘরে বাইরে শুনে আসছি সব তার সৃষ্টি। অনেক অনেক প্রশ্ন এসেছে মনে, জিজ্ঞাসা করলেই বলত ডেঁপো ছেলে। প্রমা-ণের কি আছে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এবং তোমার পূর্ব পুরুষেরা বিশ্বাস করে আসছে, তোমাকেও তাই বিশ্বাস করতে হবে বিনা প্রশ্নেই। এসব বলেই দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেশী বললেই কখনও কখনও মার জুটতো কপালে। ধর্মের বিবর্তনের এবং ঈশ্বর গড আল্লাহদেরও বিবর্তন ঘটেছে এই পৃথিবীতে। ব্যাবিলন সুমের মিশর আরব নরওয়ে রোম

গ্রীসের পেগান বা মূর্তিপূজকদের দেবদেবীদের ইহুদী খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বিলুপ্ত করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে। একমাত্র ভারতে উদ্ভূত পেগান বা মূর্তিপূজক ধর্মগুলি টিকে আছে দীর্ঘদিন ধরে। বড় ধর্মের চাপ থাকলেও আজও সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪২০০ ধর্ম টিকে আছে। এই প্রচ-লিত বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইসলাম ইহুদী সবাই বলে তাদের নিজেদের ঈশ্বর-গড-আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরদের কোন সার্বজনিনতা নেই এবং সবাই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার সব ধর্মের প্রধান পুরুষ, কোন মহিলা নেই; বেদের পুরুষ সুক্তে বলা হয়েছে সব পুরুষের থেকেই সৃষ্টি। এদের ঈশ্বর – গড – আল্লাহ প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রত্যেকটি ধর্ম অপর ধর্মের ওপর আঘাত হেনেই বিকাশ লাভ করেছে এবং বারবার ধর্মের কারণে পৃথিবীকে রক্তাক্ত করেছে। ভারতে ব্রাহ্মণদের সাথে চার্বাক যুক্তিবাদীদের লড়াই; হিন্দু বনাম বৌদ্ধ বা জৈনের লড়াই, শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই বাংলা দেখেছে মধ্যযুগে এবং হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টানের লড়াইও দেখেছে, দেশভাগ দেখেছে ধর্মের কারণে, উদ্বাস্তু হওয়া দেখেছে ধর্মের কারণে। রক্তাক্ত ক্রুসেড দেখেছে এশিয়ার ভূখন্ড। কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে ধর্মের কারণেই। এরপরেও ধার্মিকরা বলেন ধর্ম শান্তি দেয় চরিত্র গঠন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের এই সৃষ্টি তত্ত্বের বিরুদ্ধে চার্লস ডারউই-নের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব এক সপাটে চপেটাঘাত। এবারের মেডিসিনে নোবেলও জিনের বিবর্তনের কাজের জন্যই। বর্তমান ভারতের শাসকবৃন্দ এবং ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি চায়না ডারউইনের বিবর্তনবাদ শিক্ষার্থীদের মাথাতে ঢুকুক তাই সিলেবাসের থেকে ডারউইন বাদ। এর বিরুদ্ধে লিখতেই এই প্রবন্ধ।

চার্লস ডারউইন ইংল্যান্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। নিজেও প্রচণ্ড ধর্মভীরু ছিলেন এবং ভবিষ্য-তে ধর্মযাজক হওয়ার স্বপ্নও দেখতেন। কারণ ইংল্যান্ডে সেই সময় ধর্মজাজক হওয়া যথেষ্ট সম্মানের। কিন্তু জীব বিজ্ঞান

নিয়ে কাজ করার সময় জীব ও জীব সৃষ্টির জিজ্ঞাসা ডারউইনের কিশোর মনে ঝড় তুলেছিল প্রচন্ডভাবে। সেই ঝড়েই ডারউইনের জাহাজ বিগল গ্যালাপাগাস দ্বীপে অবতরণ করলো ১৮৩৫ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী (১২ই ফেব্রুয়ারী ডারউইনের জন্মদিন)। ডারউইনের চিন্তা ভাবনাকে যেন উসকে দিতেই এইদিন চিলির উপকূলে নোঙর করা অবস্থায় তাঁদের জাহাজ এইচ এম এস বিগল কেঁপে উঠলো প্রবল এক-ভূমিকম্পে! দুই মিনিটের সেই ভূমিকম্প শেষে ডারউইন এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন মহাবিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলেন উপকূলের ভূমির উচ্চতা বেড়ে গেছে প্রায় আট ফুট! তাহলে কি লায়েলের Principle of Geology'র কথাই ঠিক? সব পরিবর্তনই কি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা করা শক্তিগুলোর ফলাফল?

১৮৩১ সালে জাহাজে ওঠার আগে ডারউইনকে তাঁর শিক্ষক এবং একইসাথে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর হেনেস্লো অপর এক প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক চার্লস লায়েলের লেখা Principle of Geology বইটি উপহার দেন। গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হেনেস্লো কড়াভাবে ডারউইনকে বলে দেন যেন ভুলেও লায়েলের লেখাগুলোকে বিশ্বাস না করেন! কিন্তু ডারউইন জাহাজে যেতে যেতে প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা দেখতে দেখতে গুরুর উপদেশ ভুলে গভীর সন্দেহে নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন একের পর এক। কি ছিল লায়েলের সেই বইয়ে! লায়েল তাঁর বইয়ে বলেছিলেন, "নূহের আমলের এক কথিত মহাপ্লাবন দিয়ে পৃথিবীর ভূ-ভাগ রূপান্তরিত হয়নি। ভূভাগ বিবর্তনের অন্যতম কারণ হল বাতাস, বৃষ্টি, ভূমিকম্পের মতন অসংখ্য ছোটবড় প্রাকৃতিক শক্তি। এগুলোই অতীত থেকে বর্তমান সময়ে ভূভাগের পরিবর্তন ঘটিয়ে এসেছে এবং আসছে।" গুরুর কথা ভুলে ডারউইন তাই মনোনিবেশ করলেন আশেপাশের ভূপ্রকৃতির উপর এবং আস্তে আস্তে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন লায়েলের সেই যুক্তিপূর্ণ রূপান্তরের মতবাদে। আর তার চাক্ষুষ প্রমাণ আজ পেলেন।

এই ভূমিকম্প নিয়ে ভাবতে ভাবতেই যাত্রাপথে আবার জাহাজে করে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫ ফুট উঁচু একটি দ্বীপে। সেখানে দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে এক রহস্যময় সাদা দাগ চলে গেছে মাইলের পর মাইল। পরীক্ষা করে জানা গেল রহস্যের তেমন কিছুই নেই, শামুক ঝিনুকের খোলের চুনাপাথরের ক্ষয়ই এই লম্বা দাগের রহস্য। কিন্তু শামুক ঝিনুক এতো উঁচুতে এক পাহাড়ের গায়ে এলো কিভাবে? তাহলে কি একসময় সেই পাহাড় লুকিয়ে ছিল সমুদ্রের জলের নিচে?

আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটি দেখা গেল গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপ-পুঞ্জে নামার পর। এই দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপ দেখতে দেখতে তরুণ ডারউইন দেখতে পেলেন বিভিন্ন প্রজাতির একগাদা ফিঞ্চ পাখি, যেগুলোকে আমরা ফিঙে নামে ডাকি। ডারউ-ইন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সবগুলোই ফিঞ্চ পাখি হলেও অবাক করা জিনিস হলো এদের খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী বদলে গেছে এদের গঠন। যেমন যেগুলো গাছে থাকে তারা খায় একরকম খাবার, যেগুলো মাটিতে থাকে তারা খায় আরেকরকমের খাবার। খাবারের ধরন অনুযায়ী সেই পাখি-গুলোর আকৃতিও বিশেষ করে চঞ্চু আলাদা! তিনি এই বৈচি-ত্র্য দেখতে দেখতেই এদের ১৩টি প্রজাতির বর্ণনা দেন, দেখান প্রজাতির বৈচিত্র্য। এই ১৩টির পর বর্তমানে আর একটিসহ মোট ১৪টি প্রজাতির ফিঞ্চ আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই। এই পাখিদের দেখার পরেই তিনি প্রাথমিকভাবে সম্মত হলেন যে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই জীবের মাঝে একেকরকম বৈ-শিষ্টের পরিবর্তন ঘটে এবং তারা ক্রমেই অভিযোজিত হয়ে তৈরি করে এক বা একাধিক নতুন প্রজাতি! সুতরাং প্রজাতি হল এমন কিছু জীবের সমষ্টি যারা শুধু নিজেদের মধ্যে প্রজন-নে সক্ষম। যেমন- আধুনিক মানুষ Homo sapiens sapiens প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন প্রজাতির সঙ্গে তারা কেউ প্রজনন করতে পারবে না!

ডারউইন আদতে এই তথ্যটি প্রকাশ করতে যথেষ্ট দ্বিধা

করেছেন। কেননা তিনি নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর দেওয়া মতবাদ কতটা বৈপ্লবিক। আরেক বিজ্ঞানী হুকারের কাছে লেখা চিঠিতে তাই তিনি লিখেছিলেন- নিজেকে তাঁর বড় একজন অপরাধী মনে হচ্ছে, তিনি যেন একজন নরঘাতক হিসেবে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন! তাই তত্ত্বের সত্যতা জেনেও কেবলমাত্র সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হতে তিনি আরও ২০ বছর ধরে গবেষণা করে লিখলেন জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত বই- The origin and Species by means of Natural Selection!!

ডারউইনের তত্ত্ব যে ভুল নয় তার প্রমান আমরা দেখতে পাই অন্যপ্রাণীদের মতন মানুষেরও অসংখ্য প্রজাতি আবিষ্কৃত হওয়ায়। এগুলোর মধ্যে হোমিনিড গণের অন্তর্ভুক্ত হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো ইরেক্টাস-সহ অসংখ্য প্রজাতির ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের মতন আরও অন্য এক প্রজাতি নিয়ান্ডারথালদের ফসিল। অনেক গবে-ষণার পর দেখা গেছে এক প্রজাতির বনমানুষ বা এপদের সঙ্গে মিলে গেছে আমাদের ডিএনের প্রায় ৯৮.৬%! ডারউ-ইনের সময় কার্বন ডেটিং-সহ অনেক পরীক্ষার সুব্যবস্থা না থাকলেও এটা এখন পরীক্ষিত গবেষণাধর্মী সত্য যে, ৪০-৮০ লক্ষ বছর আগে একধরণের জাতি দুইপায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তাদের থেকে বর্তমান আমাদের অর্থাৎ আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র দেড় থেকে দুইলক্ষ বছর আগে। এপর্যন্ত একটি ফসিলও পাওয়া যায়নি যেটি ডারউইনের প্রা-কৃতিক নির্বাচন মতবাদকে সমর্থন করে না। এমনকি মজার কথা হল ডারউইন পূর্ববর্তী সময়েও জর্জ বুফো, হাওয়ার, ওয়ালেস, উইঙ্গারসহ বেশকিছু বিজ্ঞানী ছিলেন যারা বুঝতে পেরেছিলেন প্রজাতি স্থির নয়, চলমান বিবর্তনের ফসল। কিন্তু এরা বিবর্তনকে মেনে নিলেও সেটি কিভাবে ঘটে তা কেউই ডারউইনের আগে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের বহুল পঠিত Ancestor's Tale বা আশির দশকে ড. টিএম বেড়ার লেখা Evolution and Myth of Creationism কোনওটিই ডারউইনের বি-

বর্তনবাদ অতিক্রম করেনি, বরং সমর্থন যুগিয়েছে বহুগুনে। ডকিন্স তাঁর প্রতিটি লেখায় তুলে এনেছেন বিবর্তনবাদের মৌলিকত্বকে। তিনি বারবার বলেছেন - এখন পর্যন্ত একটি ফসিলও ভুল জায়গায় আবিষ্কৃত হয়নি যেটি বিবর্তনবাদকে ভুল প্রমাণ করতে পারে!

বিজ্ঞান গতিশীল, যে গতিশীলতা প্রজাতিগুলোর পারস্পা-রিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। হাজার বছরের বিশ্বাসকে লালন করার নাম বিজ্ঞান নয়, বিশ্বাসকে যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবচ্ছেদ করা এবং তার সত্যতা বা মিথ্যাচারকে সত্যের আলোকে উন্মোচন করাই বিজ্ঞানের কাজ। ডারউইনবাদ আর বিবর্তন এতটাই প্রমাণিত যে সেটি ঘটেছে কি ঘটেনি তা নিয়ে সন্দে-হের কোনওই অবকাশ নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে ঈশ্বর আশ্রিত ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি ডারউইন , বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা না করলে হয়ত যাজকই হতেন বা ধর্ম তত্ত্বের অধ্যাপক হতেন , আবার মন থেকে জীব সৃষ্টির সেই ঈশ্বরের তত্ত্ব মেনে নিতেও পারেননি ডারউই-ন।হাজার হাজার বছর ধরে যে ধর্ম ঘিরে রয়েছে পৃথিবীকে (থুড়ি পৃথিবী বললে ভুল হবে এশিয়া-আরব-ইউরোপকে। কারণ আমেরিকা ওসেনিয়া মহাদেশের কথা কোনও প্রাতি-ষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থতে ছিলনা । ১৫২৬ সালের আগে আমেরিকায় সভ্য মানুষের পদার্পন ঘটেনি। শেষ সংগঠিত ধর্ম ইসলামের জন্ম ৬০০ সাল নাগাদ। ডারউইন ধর্মের আলোকে জীবের সৃষ্টির উত্তর পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন, কিন্তু অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারলেন না। পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন লকের বিখ্যাত উক্তি "বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব" আবার তাঁকে অশান্ত করে তুলল। সুযোগ পেলেন জীব বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার, চাপলেন বিগল নামের জাহাজে গ্যালাপাগাস দ্বীপে যাওয়ার জন্য। গ্যা-লাপাগাস দ্বীপে তিনি বিভিন্ন জীবজন্তুর সন্ধান পেলেন এবং হাজার হাজার জীবাশ্মের সন্ধান পেলেন, প্রায় ২৫০০০ জীবাশ্ম

পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডে। দীর্ঘদিন সেগুলি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এলেন জড় পদার্থ থেকেই জীবের উৎপত্তি এবং তার ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়ে মানুষের উৎপত্তি। তিনি লিখলেন "the origin of species by means of natural selection,of the preservation of favoured races in the struggle for life" এই বইটা বেরোনোর সাথে সাথে সংগঠিত ধর্মের বিকৃত মানুষেরা প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করলো। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, জিওনার্দো ব্রুনোর পর ডারউইনের এই আঘাতে প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিতই ছিল। ইংল্যান্ডের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁকে নানানভাবে অপদস্থ করা থেকে প্রাণে মারতেও চাইলেন। শুধু প্রাণে মারতে পারেনি কারণ ডারউইনের সমর্থনে ঈংল্যান্ডের কিছু বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। (আমাদের দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক সুশ্রুতের শল্য চিকিৎসা যখন ব্রাহ্মণদের নেতা যাজ্ঞবল্ক বন্ধ করে দিলেন তখন কিন্তু তিনি কারো সমর্থন পাননি, নয়তো ভারত আজ চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেত) এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় টমাস হাক্সলি, শল্য চিকিৎসক ডাঃ ওয়েনের কথা। টমাস হাক্সলিকে ডারউইনের ডালকুত্তা নামেও অভিহিত করা হয়।

দর্শনের যে মূল সংঘাত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ডারউইন। ধর্মে জীব সৃষ্টিতে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ডারউইনের বইতে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বর নেই আছে "প্রকৃতি ও পরিবেশ"। ঈশ্বরের ঠাই নেই সেখানে। সেসময় ডারউইনকে কি পরিমাণ আক্রমণ হজম করতে হয়েছিল নীলকণ্ঠ হয়ে তা এখন ভাবা যায় না। এই ধর্মান্ধ কীটেরা কি ভয়ানক তা আজ পাকিস্তান বাঙলাদেশের আমাদের মত উদ্বাস্তুরা ও মুক্তমনারা জানে, জানে অভিজিত রায়, রাজিব, ওয়াশিকুর, নাজিমুদ্দিন, নিলয় বা আমাদের দেশের দাভালকার-পানেসর-কালবুর্গী-খলিল-গৌরি লঙ্কেশ। সারা আরবের সিরিয়া, জর্ডন, ইরাক, তুরস্কের উদবাস্তুরা জানে, পাকিস্তান, আফগানিস্তা-

নের উদ্বাস্তুরা জানে। এই সব উদ্বাস্তুদের তথাকথিত কোন ঈশ্বর—আল্লাহ-গডেরা রক্ষা করে না। আমেরিকাতে ডারউ-ইনের বিবর্তনবাদ পড়ানোর জন্য শিক্ষকের শাস্তি হয়েছিল, যা মাঙ্কি ট্রায়াল নামে সারা পৃথিবীতে খ্যাত।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে অনেক প্রখ্যাত পদার্থ বা রসায়ন বৈজ্ঞানিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছেন অনেকদূর। কিন্তু বিজ্ঞানের কাজের প্রভাব বিজ্ঞান ছাড়িয়ে সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতকে সব থেকে আলোড়িত করেছিল চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ। ডারউইনের উপর সারা পৃথিবী জুড়ে সংগঠিত ধর্মের একের পর এক আক্রমনই এর সব থেকে বড় প্রমাণ। একারণেই সংগঠিত ধর্ম কোনওদিনই ডারউইনকে পছন্দ করেনি বরং বিরোধীতা করেছে। তাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান মৌলবাদীদের দ্বারা ডারউইনকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা হবে সেটাই স্বাভাবিক। এইজন্যই সিলেবাস থেকে ডারউইন বাদ। এরা সবাই ধপাস তত্ত্বে বিশ্বাসী।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“একটি ভুলকে ধ্বংস করা এতই ভালো যে, তা নতুন একটি সত্যকে উদঘাটন করতে পারে।”

- চার্লস ডারউইন

সূচিপত্র

অলৌকিক নয়, লৌকিক

লিখেছেন – মহম্মদ মহসীন

বাস্তব কথা হলো, এ জগৎ এক বস্তু জগৎ। তবু মানুষ কল্পনা করতে ভালবাসে, কল্পনার এক জগত গড়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

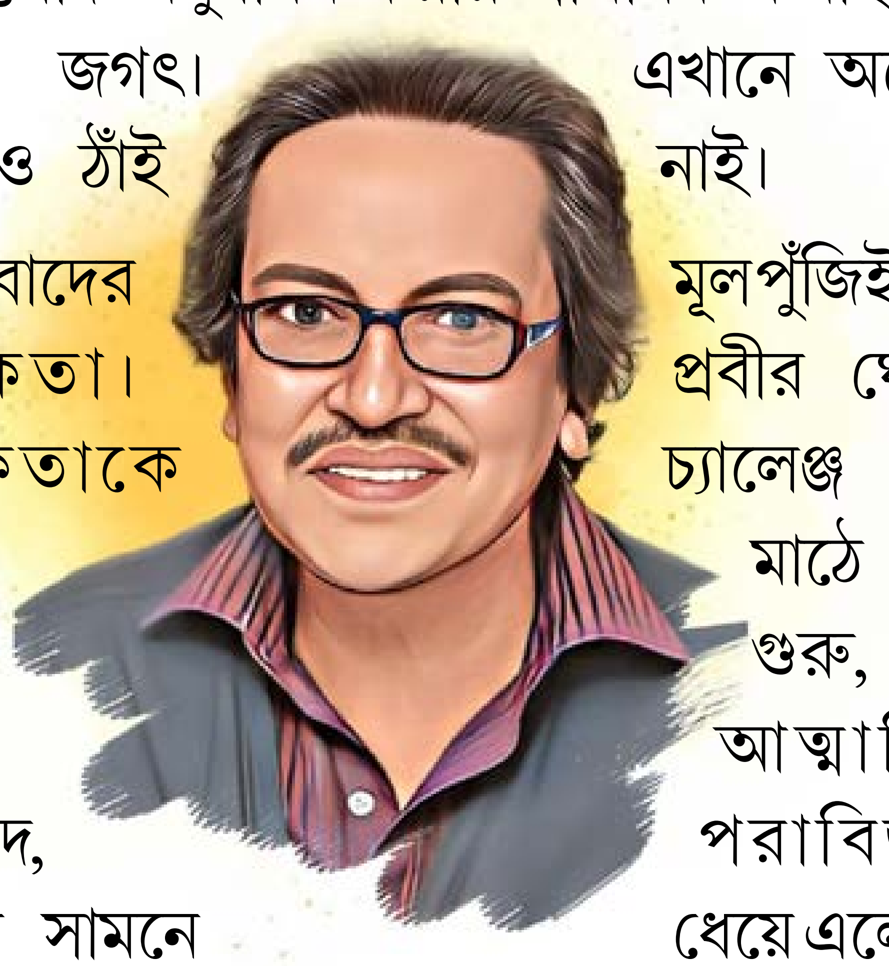
এই মানসিকতাকেই পুঁজি করে পূঁজিবাদীরা তৈরি করেছে এক হাতিয়ার। সেটি হলো ভাববাদ। ভাববাদে ঈশ্বর, সৃষ্টি-কর্তা, আত্মা, প্রেতাত্মা প্রভৃতি কাল্পনিক জিনিসের অবতা-রণা করা হয়। ক্যাপিটালিজমের বহুল প্রচারে সমাজমানসে এইসব আত্মা, ভূত, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি হাবিজাবি কা-ল্পনিক অস্তিত্বহীন জিনিস বিভিন্ন অস্ত্রের বারংবার ব্যবহারে, বিভিন্নভাবে ব্যবহারে, মানব মনে বিশ্বাসের মুখোশ তৈরি করতে সক্ষম হয়, সফল হয়। মানুষ এসবে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। তার এই বিশ্বাস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে আত্মিকরণ করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ জগৎ যে শুধুই বস্তুজগৎ, এছাড়া অন্য কিছুই নয়, তা বলীষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন প্রবীর ঘোষ। গত শতকের আটের দশকে লক্ষ বাধাকে যুক্তিবাদের ধারে স্বমহিমায় অতিক্রম করতে পেরেছেন প্রবীর ঘোষ।

উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে মানুষকে মানবেতর প্রাণী করে রাখাটা খুব দরকার পড়ে। এজন্য এইসব কাল্পনিক জিনিস তাদের মনে প্রোথিত করার খুব প্রয়োজন। কিছু কিছু প্রফেট, ধর্ম প্রচারক, ধর্ম প্রণেতা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বস্তুবাদের বিরোধীবাদ প্রচার করে থাকেন যা আসলে ক্যাপিটালিজম দিয়ে শোষণকেই সমর্থন করে চলে।

মুনাফার লোভ চালায় শোষণ। শ্রমিক মানসে যখন জন্ম নেয় সংগ্রামের ইচ্ছার পাখি। অধ্যাত্মবাদ, অদৃষ্টবাদ, স্ব-

র্গ-নরক-কল্পনা সেই সংগ্রামী পাখীকে থামিয়ে দেয়, উড়তে না দিয়ে বন্দি করে ধর্মের খাঁচায়। শ্রেণিবিহীন সমাজ গড়তে বিপ্লবের ইচ্ছাকে দমিয়ে দেয় এইসব অধ্যাত্মবাদ। মানুষকে অন্ধ করে দেয়। এক ধরণের জম্বি (zombie) তৈরি করে দেয়। মানুষের শ্রেণিচেতনাবোধ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিরোধীবাদগুলি সেই চেতনাকে মেরে ফেলে চারদিক দিয়ে আক্রমণে। গড়ে উঠতেই দেয় না।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুধাবন করার প্রাথমিক কথাই হলো, এ জগৎ বস্তু জগৎ। এখানে অলৌকিক-তার কোনও ঠাঁই নাই।



কিন্তু পুঁজিবাদের মূলপুঁজিইতোহলো অলৌকিকতা। প্রবীর ঘোষ সেই অলৌকিকতাকে চ্যালেঞ্জ করলেন একেবারে মাঠে ময়দানে নেমে। গুরু, গুরুবাবা, জ্যোতিষী, আত্মাবিশেষ-জ্ঞ, ভূতবিদ, পরাবিজ্ঞানবা-দী সকলের সামনে ধেয়ে এলেন সুনামি হয়ে। এক ধাক্কায় ধুয়ে গেল এইসব অলৌকিকতাবা-দের ধারকের, বাহকেরা।

প্রমাদ গুণলো এই সব মিথ্যাশ্রয়বাদীরা। বিপন্ন হল তাদের অস্তিত্ব। তাই সকলে একযোগে আক্রমণ করতে থাকল তারা। তাদের তাসের ঘর রক্ষা করতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করল। নিয়োগ করল নানান এজেন্সি। আজও সক্রিয় সেই সব এজেন্সি। নইলে যে তাদের মিথ্যের দুনিয়া প্রকাশ হয়ে পড়বে। ভেঙে পড়বে তাদের অলৌকিকতার সাম্রাজ্য।

প্রবীর ঘোষ হলো সেই ব্যক্তির নাম, যে নাম যুক্তিবাদের সমা-র্থক অন্য নাম। সমাজে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল নবজাগর-ণের ঢেউ। যুক্তিবাদ-নদের ঢেউ। সেই নদীতেও বাঁধ দিতে লাগল স্বার্থান্বেষী এক চক্র। আজও তারা সক্রিয়। পি.জি যেদিন মারা গেলেন, গর্তের অন্ধকার থেকে হিলহিল করে

বেরিয়ে আসতে লাগল, কাদা ছুঁড়তে লাগল, সেইসব অন্ধ-কারের জীবগুলি। প্রবীর ঘোষ মারা গেছেন, কিন্তু আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল তাঁর ঘোষিত চ্যালেঞ্জ। এইসব অন্ধকারের জীবেরা তো পাঁক ঘাঁটা জীব,

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে মৃত প্রবীরকেও মারতে পারে না।

তাই প্রবীর ঘোষের সামনে অলৌকিকতার দাবিদারের সংখ্যা শুণ্য।

এতেই এইসব অলৌকিকতাবাদীদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু ঐ যে বলে না, লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়। এরাও মিথ্যার পশরা সাজিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে আছে, রূপ পালটে, ছল পালটে, ঢঙ পালটে।

যতদিন এই যুদ্ধ চলবে, প্রবীর ঘোষ ততদিন বেঁচে থাকবেন যুক্তিবাদীদের আদর্শ হয়ে। ততদিন তাঁর চ্যালেঞ্জ, তাঁর বইগুলি যুদ্ধের মারণাস্ত্র হয়ে তাদের রাত্রের নিদ্রায় ত্রাসের অস্ত্র হয়ে ভয় দেখিয়ে যাবে। ভীতের চিৎকার শোনা যাবে। আজ যেমন শোনা যাচ্ছে।

যুক্তিবাদের পথ চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে। কারণ এ পথ কাল্পনিক কোনও গোঁজামিল দিয়ে তৈরি নয়। সত্য ও সত্যার্থ দিয়ে তৈরি।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“ব্যক্তি-শ্রদ্ধা, ব্যক্তি-পূজা যেখানে ভক্ত যুক্তিহীন করে তোলে, অন্ধ-স্তাবক করে তোলে, সেখানে ব্যাপারটা নিশ্চয় নিন্দনীয়। কিন্তু শ্রদ্ধেয়র প্রতি শ্রদ্ধার, অতি শ্রদ্ধেয়র প্রতি অতি- শ্রদ্ধা তো আদৌ্পেই নিন্দনীয় নয়।”

- প্রবীর ঘোষ

সূচিপত্র

বহিষ্কৃত ছাত্র ও শিক্ষককুলের অধোগতি

লিখেছেন – অনির্বাণ পাত্র চৌধুরী



সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রকে (মুস্তাকিন সাহা) বহিষ্কার করা হল। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণ ভাবে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও,

সেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলেটির উদ্ধত আচরণ। ছেলেটি তর্ক করছে শিক্ষক মহাশয়ের সাথে। ছেলেটি দেরি করে বিদ্যালয়ে এসেছে। প্রাথমিক ভাবে এটা জানা গেলেও পরে জানা গেল ছেলেটি টিফিন-এর পর স্কুলে আসে এবং ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে। (যদিও ভিডিওটিতে এইরকম কিছু দেখা যায় না) অভিযুক্ত ছেলেটিকে কমন রুমে-এ এনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় শোনা যায় - ছেলেটি বলছে তার "চুল ধরতে পারবেন না" এবং একটি শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বলে-"দম থাকলে মাঠে আসুন"। একজন শিক্ষক বলেন-"তোর লিমিট কত দূর?" ছেলেটি বলে- "পুরো দীঘা আমার লিমিটে আছে, আজকে বেরিয়ে দেখুন"। যাইহোক এই ধরণের কথাবার্তা আমরা ভিডিওটিতে দেখতে পাই। পরে জানা গেল এই ঘটনার সাথে যুক্ত শিক্ষক মহাশয়কে নাকি সে মারধরও করেছে। এটি একটি গুরুতর অভিযোগ যার সত্যতা কতখানি তা বিচার্যের বিষয়। বর্তমানে ছেলেটি বহিষ্কৃত হয়েছে।

অতএব বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে সে আর ঢুকতে পারবে না। বই খাতার সঙ্গে তার যেটুকু সম্পর্ক, এই বিদ্যালয়ে

যাওয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল তা ছিন্ন হল। বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত এই ছেলে সমাজ থেকেও বিতাড়িত হতে থাকবে ধীরে ধীরে। ক্ষণিকের ঔদ্ধত্য, অজ্ঞতা, অসংযমীতা হয়ত তাকে ঠেলে দিল এক অন্ধকারময় জীবন পথে কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মহান শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যই তো অজ্ঞতা কে দূর করা। প্রতিকূল স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ এক বিজ্ঞ মানুষ তৈরি করা।

কিন্তু না, মহান শিক্ষকদের উদ্দেশ্য হয়ত তা নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল বিষয় ভিত্তিক শিক্ষাদান। বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত এই বিষয় গুলি ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্ত করান।

এই পুঁথিগত শিক্ষার মূল্য অবশ্যই আছে। এই বিষয় গুলির উপর গভীর অথবা সাধারণ ধারণা প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রীর থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসংস্থান এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে। আমাদের মহান শিক্ষক মহাশয়েরা এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন এই বিষয়গুলি রপ্ত করতে পারলে ও পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তাঁদের কাছে এটাই হোল শিক্ষার মূল্য বা লক্ষ্য এবং আমাদের সমাজে বেশীর ভাগ মানুষই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে এইটাই মনে করেন। তাই বর্তমানে শিক্ষকদের শিক্ষাদান এই সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও সমাজের এই হীন মানসিকতার উর্ধ্বে অবস্থান করাই শিক্ষক মণ্ডলীর কাম্য ছিল।

তাঁদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে কিছু আচরণগত দিক আছে যেগুলি বেশীর ভাগ সময় লক্ষ্য করা যায় – সাধারণত শিক্ষক মহাশয়েরা বিষয়ের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের উপর বিশেষ যত্নশীল হন। অপর

দিকে অনাগ্রহী বা অমোনযোগী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি উদাসীন থাকেন।

তাদের তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা ছাড়া অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে দেখা যায় না। আর অতিরিক্ত কিছু ঘটনা ঘটলে অভিভাবকদের নালিশ জানান তাঁরা।

শাস্তি এবং তিরস্কার হল একটি সাময়িক উপশম। ঠিক পে-ইনকিলার এর মতন এর উপকারিতা কিছুক্ষণের জন্য স্থায়ী। মূল চিকিৎসা এটা নয়। চিকিৎসকেরা বলেন এই পেইনকি-লার বেশী প্রয়োগের ফলে আরও জটিল রোগের কবলে পরার সম্ভাবনা থাকে। অতএব ছাত্রছাত্রীরা কেন অমোনযো-গী হচ্ছে, কেন তারা অনাগ্রহী হচ্ছে এর মূল কারণ অনুসন্ধা-নের প্রচেষ্টা বা ইচ্ছা যদি শিক্ষকগণের মধ্যে না থাকে তাহলে এ রোগের উপশম হবে না। ফলে বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যেটিকে এঁনারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সেটিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়,বড়ো সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে। ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনে এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রভাব তারা প্রতক্ষ্য করে এবং হতাশায় ভোগে ও পরিণত বয়সে এসে নিজেদের দোষারোপ করে। শিক্ষকগণেরা একটা দীর্ঘ সময় পান এই পরিণতি থেকে ছা-ত্রছাত্রীদের রক্ষা করার কিন্তু তাঁরা এ বিষয় মোটেই চিন্তিত নন।

তাঁদের আচরণের আরেকটি দিক হলো–তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে বলে থাকেন– আমি শ্রেণিকক্ষে সমস্ত কিছুই শিখিয়েছি আপনার সন্তান যদি গ্রহণ করতে না পারে, আমার তো কিছু করার নেই।

ছাত্র বা ছাত্রীরা অকৃতকার্য হলে তার দায় তারা গ্রহণ করেন না। তবে সফল হলে কৃতিত্বের দাবি জানাতে তাঁরা ভোলেন না। কৃতিত্ব যে একেবারেই নেই সেটা বলা ঠিক নয়। দক্ষ শিক্ষক আছেন। বিষয়ের প্রতি অগাধ পাণ্ডিত্য আছে এমন শিক্ষকও দেখা যায়। কিন্তু কতটা নিষ্ঠা ও সততার সাথে তিনি তা বিতরণ করেন তা সন্দেহাতীত নয়। আদর্শ রাষ্ট্র নায়কের যেমন উচিৎ দেশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত নাগরিকটিরও খেয়াল রাখা ও

তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা সেই রকম পিছিয়ে পড়া সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নজর দেওয়া শিক্ষক মহাশয়দের নৈতিক কর্তব্য।



শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন ছাত্রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার অপমান জনক কথাবার্তা কখনই কাম্য নয়।এক্ষেত্রে উচিত উপস্থিত বুদ্ধি ও অন্তদৃষ্টি দিয়ে কোন্ সমাজ, কোন্ পারিবারিক পরিমণ্ডল ও কোন্ আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে ছেলেটি বড় হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে বাস্তব বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা তার ঐ আচরণ কে নিয়ন্ত্রনে আনা। ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা, প্রসন্নতা এই মানবিক গুণে বলিয়ান হয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন ও ভবিষ্যতে এক সৎ, সুন্দর মানুষ তৈরি করাই শিক্ষকদের প্রধানলক্ষ্য হওয়া উচিত, যা হল শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

বুদ্ধির তারতম্যের জন্য বা জৈবিক কারণে সকল শিক্ষার্থীর সমান মেধা হয় না। নির্দিষ্ট একটি শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিক ক্ষমতাও সবার থাকে না। যার ফলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন পেশায় অগ্রসর হয়। যেহেতু কোন পেশাই ছোট নয় এবং সমস্ত শ্রেনীর মানুষেরই সমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাই কেউ যদি ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, বাজারের সবজী বিক্রেতা বা রাজমিস্ত্রীও হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তাঁদের মধ্যে যদি সততা থাকে এবং তারা যদি কর্তব্যনিষ্ঠ হয় তাহলে সমাজ সুন্দর হবে। অন্যথায় সমাজ দুর্নীতিগ্রস্থ হবে। অতএব ছাত্রছা-

ত্রীদের আচার ব্যবহার, তার অসৎ প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার গুরু দায়িত্ব শিক্ষকদের। বেয়াদব ছাত্রকে বহিষ্কার করে তাকে শাস্তি দেওয়া নয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের সেই স্কুলে দেখা যাচ্ছে একজন শিক্ষক মহাশয় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন- "ছেলেটিকে আমরা বহিষ্কার করলাম"। এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ছেলেটি দী-র্ঘদিন ধরে স্কুলে আসছে, এই দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যালয়ের প্র-শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ শিক্ষকগণ ষোলো-সতের বছরের একটি ছেলেকে সামলাতে পারলেন না! নতি স্বীকার করলেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাপুরুষের মত ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন এবং সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণা করলেন।

সবাই বিদ্যাসাগর রচিত 'গোপাল' চরিত্রের মতন সুবোধ বালক হয় না, দুষ্টু রাখালের মতনও বালক থাকে। দুষ্টু বালক কে সুবোধ বালকে পরিবর্তন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা শি-ক্ষকদের উচিত নয় কি? অনেকে বলছেন ঐ ছেলেটির কোন পরিবর্তন হবে না। এই কথাটি যুক্তিসম্মত নয়। পৃথিবী বা বি-শ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। জৈবিক বা অজৈবিক সব কিছুই। ছেলেটির এই রকম আচরণ নির্দিষ্ট একটি সময়ের মানসিক অবস্থা মাত্র। আমরা জানি সময়ের সাথে সাথে অভি-জ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু সে একটি মানুষ অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রানী সে বিপরীত চিন্তাটাও এক সময় করবে। এই সময় তার মানসিক চিন্তার যে বক্রতা তা সোজা পথে নিয়ে যেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে কিন্তু সেটা অসম্ভব নয়। তার জন্য দরকার আদর্শ শি-ক্ষকের যার মধ্যে থাকবে মানবিকতার গুণ। স্কুলের পাঠক্রম শেষ করার তৎপড়তার চেয়েও বেশী শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করার সদিচ্ছা। হিংসা বা দস্যু প্রবৃত্তি সমস্ত মানুষের মধ্যেই বর্তমান। আমরা এখন এই ছেলেটির কথা ভাবছি, সমাজবিরোধীদের দলে তাকে ফেলছি, তাকে বিদ্যালয় থেকে

দূরে রাখছি কারণ সে অযোগ্য। কিন্তু যোগ্য ছাত্রছাত্রীরাও বি-দ্যালয় থেকে সফল ভাবে কৃতকার্য হয়ে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও সমাজবিরোধীতার কাজে যুক্ত হয়ে সমাজের ক্ষতি সাধন করে চলেছে এমন সংখ্যাও কম নয়। অতীত বা বর্তমান সময়কালে আমরা দেখেছি উচ্চপদস্থ বহু কর্মচারী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কিন্তু উচ্চশিক্ষিত। অতএব ভবিষ্যতে একটি ভালো শিক্ষার্থীর মন্দদিকে আবার একটি মন্দ শিক্ষার্থীর ভালোদিকে অগ্রসর হওয়ার উভয় সম্ভাবনা থাকে। গোড়াতেই একজন ছাত্রছাত্রীর সঠিক চারিত্রিক মূল্যা-য়ন করে তাকে মন্দ পথে অগ্রসর হওয়ার প্রবনতাকে যদি কম করা যায় বা নির্মূল করা যায় তবে সেটাকেই শিক্ষার অগ্রগতি বলে চিহ্নিত করা যাবে।

শিক্ষাবিদরা বলেন শাস্তি দেওয়ার প্রবনতা তখনই আসে যখন শিক্ষক বা শিক্ষিকা অক্ষম হয়ে পড়েন। (আমি এখানে চরম শাস্তির কথা বলছি, যেমন স্কুল থেকে বহিষ্কার) “Infliction by punishment is the teachers failure” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন “রাষ্ট্রতন্ত্রই হোক বা শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শা-সননীতি শাসয়িতার অযোগ্যতার প্রমাণ”।

একটি আদর্শ শিক্ষকের পাঠদান ছাড়া যে আবশ্যিক গুণগুলি থাকা প্রয়োজন বা যে নীতি মেনে চলা উচিত সেগুলি হল - সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা, সম্মান প্রদর্শন করা, ধৈর্যশীল-তা, সহিষ্ণুতা। এই গুণগুলি সাধারণ মানুষের থেকে তাঁদের পৃথক করে এবং এক নক্ষত্রসম বিরাটত্বের আসনে তাঁরা বিরাজ করেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তাঁদের ঐ রকম এক উচ্চস্থানে রাখেন এবং ওঁনারা এই বিষয়টি বেশ উপভোগ করেন ও বিশেষ ক্ষেত্রে এর যথার্থ সদ্ব্যবহারও করে থাকেন। তাঁদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও এই রাজকীয় সম্মানের দ্বৈত মিলনের দম্ভে তাঁরা মনে করেন তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাঁদের কিছু বলা যাবে না কারণ তাঁরা শিক্ষক অর্থাৎ দেবতু-ল্য।

আমি মনে করি সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষকের আসন এবং

পরবর্তী ক্ষেত্রে দেবতার আসনে স্থান পাওয়ার এই ক্রমবিবর্তন তাঁদের শিক্ষকের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে। যে নক্ষত্রসম বিরাটত্বের আলোয় অন্ধকার দূর হওয়ার কথা,সে নক্ষত্র আর নেই। পরিণত হয়েছে একটা গ্রহে বা উপগ্রহে যার নিজস্ব কোন আলো নেই,আছে শুধু "শিক্ষক"নামের একটি মুকুট। যেটি শিক্ষকের অবভাস (Appearance) বা প্রতিলিপি মাত্র। ঐ শিক্ষক নামক মুকুটের ম্লান আলোয় দিকভ্রান্ত কোন ছাত্র সঠিক পথের দিশা খুঁজে পায় না, ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং সব শেষে বহিষ্কৃত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ বলেছেন "একটি প্রদীপ অন্য প্রদীপকে তখনই প্রজ্বলিত করতে পারে যখন সে নিজ শিখায় দীপ্যমান থাকে"।

কালিকাপুর, বজবজ

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"একজন শিক্ষক সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলে, কেউ বলতে পারে না তার প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয়।"

– হেনরি এডামস

সূচিপত্র

ডিরোজিও: যে ঝড়ের পাখিকে প্রয়োজন আজও

লি খে ছে ন – অ ভি ষে ক দে



শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন- "চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও তাঁর বালকদিগকে আকর্ষণ করিতেন"। সেই চুম্বকটির আজ জন্মদিন। উনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ওনার জন্ম ১৮ এপ্রিল, ১৮০৯।

ডিরোজিও একজন ইউরেশীয় কবি, মুক্তমনা চিন্তাবিদ এবং শিক্ষক। তবে দুঃখের বিষয় খুবই অল্পবয়সেই এই তরুণ প্রাণ অকালে শেষ হয়ে যায় কলেরা রোগে (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। অনেকেই হয়ত জানেন না, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিশিষ্ট অভিনেতা উৎপল দত্তের পরিচালনায় ১৯৮২ সালে ডিরোজিয়োর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁর জীবনের শেষ দুই বছরকে ভিত্তি করে "ঝড়" নামক একটি সিনেমা তৈরি হয়। "ঝড়" সিনেমাটির মোট ১২ টি পার্ট আছে।

ডিরোজিও কলকাতার এন্টালি-পদ্মপুকুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও ছিলেন একজন খ্রিস্টান ইন্দো-পর্তুগিজ অফিস কর্মী এবং তাঁর মাতা ছিলেন সোফিয়া জনসন ডিরোজিও।

ডিরোজিও, ডেভিড ড্রুমন্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছিলেন, যেখানে তিনি ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত একজন ছাত্র ছিলেন এবং ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে

১৭ বছর বয়সে ডিরোজিও নতুন হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছি-লেন।

তখনকার সময়ে ইয়ং বেঙ্গলের তরুণেরা ছিলেন বেশ চঞ্চল প্রকৃতির। তাঁদেরকে সন্ধ্যা বেলায় জোর করে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলে সেখানে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়বার পরিবর্তে হোমার, ইলিয়ডের বই থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করতেন। দেবদেবীকে প্রণাম করার পরিবর্তে বলতেন, 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম/স্যার। দিনের বেলা লোকজনকে দেখিয়ে গোমাংস ও মুসলিমদের হাতেগড়া রুটি খেয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের খাদ্যবিধি-তে আঘাত করতেন। হিন্দুদেবী কালীকে নিয়ে ছড়া কাটতেন, হাতের নাগালে কোনও ব্রাহ্মণ পেলে "আমরা গরু খাই গো" বলে উত্যক্তও করতেন। এভাবে হিন্দুদের জাত্যাভিমানে বা বলা ভালো তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানার জন্য যত ধরনের দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় আসতো, তার সবটুকুর প্রয়োগ তাঁরা করতেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিও তাঁর অনুগামী-দের অর্থাৎ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে যে সংগঠন গড়ে তোলেন সেটি, "ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ" নামে পরিচিত। এই সংগঠনের উদ্দ্যেশ্যে ছিল- (১) তরুণপ্রজন্মের মধ্যে যুক্তি-বোধ, বিজ্ঞানমনষ্কতার বিকাশ ঘটানো। (২) নারীদের উচ্চ-শিক্ষিত গড়ে তোলা, (৩) সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস এবং জাতপাত ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং এইসকল বিষয়ে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসু মনন গড়ে তোলা, (৪) স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটানো (৫) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ইত্যাদি। এইপ্রসঙ্গে জানাই, ১৮২৮ সালে কলকাতার মানিকতলা এলাকায় "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে কাজকর্মের জন্যেই।

ডিরোজিও তার মাত্র ২২ বছরের জীবনে এমন বেশকয়েক-

টি কাজ করে গেছেন যা সত্যি অবাক করার মতন। জীবনে চূড়ান্ত আর্থিক এবং সামাজিক অবরোধের মধ্যে পড়েও তিনি যতদূর এগোতে পেরেছিলেন তা অকল্পনীয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ডিরোজিও কি সত্যিই যুক্তিবাদী ছিলেন বা ওনাকে কে কি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে?

এইপ্রশ্নের উত্তরে কিছু খোলামেলা আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন- পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যে বা যিনি সম্পূর্ণ দোষত্রুটি মুক্ত। তাই সমালোচনার ঊর্ধেও কেউ নন। কোন মানুষকে সঠিক বিচার করতে গেলে দেশ, কাল, সামান্যই পরিস্থিতি এরূপ বিবিধ বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

ডিরোজিও যেসময় জন্মেছিলেন তখন পরাধীন ভারতে সেই সময় কারো পক্ষে কতটুকুই বা বিজ্ঞানমনস্ক বা আরও ভালোভাবে বললে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব ছিল?ত-বে ডিরোজিও নিজ সময়ের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে ছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি তার পারিপার্শ্বিক সমাজে চিন্তা, চেতনার, বিজ্ঞানমনস্কতার এমন এক প্রচন্ড ঝড় তু-লেছিলেন যাকে সামাল দিতে বেসামাল হয়েছিল তৎকালীন উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ। এইজন্যই কি তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন না? ডিরোজিও ছিলেন খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান

গির্জা ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমতের কারণে তাঁর মৃত্যুর পরে পার্কস্ট্রিটের গোরস্থানে তাকে সমাহিত করতে বাধা দেওয়া হলে গোরস্থানের ঠিক বাইরে তাকে সমাহিত করা হয়।

ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গীয় গোষ্ঠীর সদস্যগণ ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম-গোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখাপোধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র,লাল-বিহারী দে, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, কিশোরী চাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাধানাথ শিকদার, কাশীপ্রসাদ প্রমুখরা। ডিরোজিওর অকাল মৃত্যুর পরে বহু ডি-রোজিয়ান অধঃপতিত হয়ে আবার হিন্দুয়ানী, বাবু কালচারের চোরাস্রোতে ডুবে গিয়েছিল যদিও তার দায় অবশ্য ডিরো-

জিওর হতে পারেনা।

এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৮৮২ সালে গড়ে ওঠে "Bengal Theosophical Society" যার সভাপতি হয়েছিলেন একদা ডিরোজিয়ান পন্থী, বুদ্ধিজীবী, যুক্তিবাদী হিসেবে চিহ্নিত প্যারীচাঁদ মিত্র। সংগঠনটির সহ-সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ও শ্যামাশংকর রায় সহ অনেকেই যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আইরিশ রমনী, থিওসফিস্ট আনি বেশান্ত যিনি ১৮৯৩ সালে ভারতে আসেন এবং সাড়াজাগিয়ে প্রেতচর্চা শুরু করেন।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যরা যে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিল তা ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও সক্রিয় ছিল। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সাফল্য ছিল খুবই সামান্য। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন পণ্ডিত ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করে জানিয়েছেন-

(১) নেতিবাচক ভাবাদর্শ: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সমস্ত কর্মসূচিই ছিল নেতিবাচক। তাঁদের কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি ছিল না। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সবকিছু না জেনেই তারা এই ধর্মের বিরোধিতায় উগ্রভাবে সোচ্চার হন। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কেও তাঁদের কোনোও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তাদের এই কালাপাহাড়ি মনোভাবের জন্য হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

(২) জনসমর্থনের অভাব: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের আন্দোলনকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারেননি। ড. সুমিত সরকার বলেছেন যে, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী অংশ ছাড়া বাঙালি সমাজের বৃহত্তর অংশের ওপর ইয়ং বেঙ্গল মতাদর্শের কোনোও প্রভাব পড়েনি।" অভিজাত পরিবারের শহরের কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল।

(৩) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই ইংরেজ কোম্পানির সহযোগী হিসেবে বিলাসবহুল জীবনযা-

ত্রা অতিবাহিত করেন। সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে তাঁদের কোনোও যোগাযোগ ছিল না।

(৪) উগ্রতা: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের উগ্র ও অতি বিপ্লবী কার্যকলাপ সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তাই কলকাতার এলিটিস্ট সমাজে এবং পত্রপত্রিকার মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড কফ তাঁদের ভ্রান্ত পুঁথি-পড়া বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করেছেন।

(৫) দরিদ্রদের প্রতি উদাসীনতা: ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের দুরবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট কৃষকদের দুর্দশা এবং কুটিরশিল্প ধ্বংসের ফলে দরিদ্র সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্ত করার কোনোও উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেননি।

(৬) মুসলিম-বিচ্ছিন্নতা: ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন শুধু হিন্দু সমাজের সংস্কার নিয়ে চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত ছিল। মুসলিম সমাজের সংস্কার নিয়ে গোষ্ঠীর সদস্যরা কোনোও চিন্তাভাবনা করেননি।

(৭) সংস্কারবিমুখতা: ডিরোজিওর মৃত্যুর পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীদের অনেকেই সংস্কারবিমুখ হয়ে সংস্কার কর্মসূচি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। অনেকে সরকারি চাকরি বা ব্যাবসায় মনোযোগ দিয়ে নিজেদের সংসার জীবনে উন্নতির চেষ্টা করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রমুখ ডেপুটি কালেক্টর এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

পরিশেষে জানাতে চাই, এই ক্ষণজন্মা মানুষটির আজ বড়ই প্রয়োজন। যে ঝড়ের বেগে আসবেন এবং ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিয়ে যাবে সমস্ত অন্ধভক্তি, উগ্রদ্বেষপ্রেম, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, জাতপাত, বিদ্বেষের রাজনীতি। আজ বিশ্বজোড়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা সংঘর্ষ খুবই জরুরি। তারপরেই হবে নির্মাণ, একটা সুস্থ, সুন্দর সমাজের।

সূচিপত্র

CIE ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' ঔপনিবেশিক শিক্ষার আদর্শ

লিখেছেন - স্বপন জানা



(প্রথম পর্ব)

জনৈক চিকিৎসক বন্ধু বলছিলেন, আমার ডাক্তার হওয়ার পেছনে মূল কারণ যন্ত্রণাময় ও আভিজাত্যহীন কৃষক জীবন থেকে পালিয়ে আসা। ১৯৭০-৭২ সালে কৃষক জীবনের অনাহার, অভাব, অনটন, বঞ্চনা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ছিল গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসার চালিকা শক্তি। যে ভাবে হোক চাকরি চাই! আরামের জীবন চাই! মা, বাবা, দাদু, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী সবার আকাঙ্খা পূরণ করার তাড়না আমাকে পেয়ে বসেছিল। হঠাৎ ডাক্তারী তে সুযোগ পেয়ে গেলাম! আজও লেখাপড়া জানা যুবক-যুবতীরা চাকরির সন্ধানে শহরমুখী!

বন্ধুটি আরও বললেন, "লেখাপড়া শেখে যে গাড়ি ঘোড়া

চড়ে সে” -বিদ্যাসাগরের লেখা পড়ে আমার আকাঙ্খার জন্ম হয়নি। সেদিনের সমাজিক ব্যবস্থাপনা থেকে এ শিক্ষা (কৃষক জীবন থেকে পলায়ন) আমার মস্তিষ্কে অন্তঃসলিলার মতো ঢুকে গিয়েছিল। পড়াশুনা আমাকে করতেই হবে।

কোন বিষয়ে নম্বর কম পেলে বাবা বলতেন “শালা পড়াশুনা করবে না, সারাজীবন লাঙ্গল ঠেলবে”। বাবার এই সাবধান বাণীতে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ছিল ঠিকই, সাথে ছিল কৃষক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা ও এক প্রচ্ছন্ন ঘৃণা। এখান থেকেও আমি কৃষক জীবন থেকে পালিয়ে আসার রসদ নিয়েছি।

ডাক্তার হয়ে ওঠার প্রাক্কালে সবাই আমার নামের শেষে ‘বাবু’ শব্দ যোগ করে ডাকতেন। সুদিন বাবু! সেদিন এক ধরনের আনন্দ পেয়েছিলাম। আর আজ, লজ্জায় মাথা নত আসে। ‘ডাক্তারী বুদ্ধির’ খাবারটা আমাকে বাবু বলে ডাকা মানুষদেরই যোগানো। চিকিৎসক হিসেবে আমাদের কাছে ওই অন্নদাতা কৃষকরা ব্রাত্যই রয়ে গেলেন। আজও দেশে এমন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়নি যেখানে অন্নদাতা কৃষকের চিকিৎসা ভালোভাবে দেওয়া যায়। সবার আগে দেওয়া যায়। আজও এই অন্নদাতা-বিরোধী সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান!

‘সিআইই’ ‘বিদ্যাসাগর’ তাহলে কি করলেন?

ভারতবর্ষ কৃষক ও কারিগরের দেশ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগ তো বটেই, আজও তাই। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণ পরিচয়’ বই খুঁজেও কৃষক, কামার, কুমোর ও তাঁতী, ঘরামী শব্দ গুলো আপনি পাবেন না।

(দ্বিতীয় পর্ব)

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন (জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কন্ঠস্বর)। নবম বর্ষ। নববর্ষ সংখ্যা। বৈশাখ ১৪২৬। এপ্রিল ২০১৯ সংখ্যার, বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সম্পর্কে লিখেছেন, “কেউ তাঁকে দেবতার

উপরে স্থান দিয়েছেন,কেউ তাঁর মূর্তি ভেঙেছেন। কিন্তু নি-রুত্তাপ একরোখা এই আটপৌর বাঙালি পন্ডিত সমগ্র জাতির উপর ছাতা মেলে দীর্ঘ আলপথ ধরে এগিয়ে চলেছেন।”

এতো ইন্দ্র মিত্র এর কথার প্রতিধ্বনি – “বিদ্যাসাগরের এই মানব বিদ্বেষ, মনে হয়, তাঁর অসামান্য মানব প্রেমেরই ফল।”

দুশো বছর পরে আজও আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগরের আদর্শ খণ্ডহর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

কি দাঁড়ালো তাহলে?

‘মূর্তিভাঙ্গার কাজ’ আর ‘দেবতা বানানোর কাজ’ এই দুয়ের মধ্যে কোনটা সমাজকে দিয়েছে গতি বা চালিকা শক্তি? মনে রাখতে হবে মূর্তি গড়ার কাজ আগে হয়েছে। পরে অন্যেরা মূর্তি ভেঙেছে। দুটোই কি সমাজের কাছে প্রগতিশীল? না। সমাজ বিজ্ঞানে তা অসম্ভব। সমাজকে কোনটা সামনের দিকে আর কোনটা পেছনের দিকে চালিত করেছে?

বিদ্যাসাগরের বসানো মূর্তি সমাজকে দিয়েছে বঞ্চনা, অপমান, অনাহার, মৃত্যু, বিনা চিকিৎসা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি। ভাঙার কাজ সমাজকে দিয়েছে গতি আর মুক্তির নিশানা।

যে শক্তিতে সমাজের উৎপাদন, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, মা-নবিকতা ইত্যাদির উন্নতি ঘটেছে, সেই শক্তি প্রগতিশীল। চলমান সমাজ যে চলমান প্রকৃতির মতোই গতিময়। তাকে থামানো মুশকিল! এটাই সমাজে চলমান শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ম।

চলমান সমাজে রয়েছে দুই মনোভাব,দুই চেতনা, দুই চিন্তার, দুই কর্মের লড়াই। দেবতা বানিয়ে মূর্তি গড়ার কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা একটা পক্ষ আর সে মূর্তি ভেঙে ফেলার লড়াই যাঁরা করেছেন তাঁরা অন্য পক্ষ। সমাজে সত্যি-মিথ্যে-,ন্যায় -অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, জনদরদী- জনবিরোধী, শ্র-

দ্ধা-অশ্রদ্ধা, দেবতা-শয়তান, দেশপ্রেমিক-দেশদ্রোহী, প্রশ্নে বিদ্যাসাগর তাঁর সময়কালে জড়িয়ে ছিলেন। লড়াইয়ে অংশ নিয়ে ছিলেন।

একই সাথে বস্তু বা মানুষের দুটো গুণই থাকে। কিন্তু প্রধান গুণ দিয়ে মানুষটির চরিত্র নির্ধারিত বা বিচার হয়। বি-দ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নেই। কোন দিকে থাকাটা জনগণের প্রয়োজন পূরণ করবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যাসাগরের জন্ম ও কর্ম ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে। ফলে যে কোন মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী হওয়া হচ্ছে ন্যায় সঙ্গত কাজ। দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তি সেদিনের দেশপ্রেমের প্রধান কর্তব্য ও দাবী। অথচ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্ন-য়ন' লিখছে,"---ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কাছে তাঁর ভারতীয় হিসাবে আত্মসম্মান বোধ ও দৃঢ়তা প্রমাণিত"। আর রবীন্দ্র-নাথ লিখেছেন, "......তিনি (বিদ্যাসাগর-লেখক) যে সকল ইংরেজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলে-রই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন"। ব্রিটিশ রাজ-শক্তির গুণগ্রাহী, নিজে আশীর্বাদ পুষ্ট আর দেশের মানুষের প্রতি ঘৃণার গরল ভান্ডার নিয়ে দুশো বছর পরেও অনেক বুদ্ধিজীবীর প্রাণের অনবদ্য রসদ!

ব্রিটিশ প্রেমের আর কি বাকি রইল? এরপর ব্রিটিশ বিরো-ধিতার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের 'চটিকাহিনী' খাপ খায় না। ইংরেজ শাসকের আশীর্বাদ লাভ না হলে ঈশ্বরচন্দ্র a Companion of the Indian Empire (CIE) in 1877। CIE উপাধি পান না।

(তৃতীয় পর্ব)

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। দুনিয়ার কৃষকরাই হচ্ছেন মানব সমাজের অন্নদাতা। ভারতের ব্যাপক কৃষকরা হচ্ছেন শিক্ষা বঞ্চিত। লেখাপড়া না জেনেই দেশের কোটি কোটি মানুষের খাবারের যোগানদার তাঁরা। তাঁরা আমাদের মহান

অন্নদাতা।

কৃষকরাই (নারী ও পুরুষ) হচ্ছেন আদি অন্নস্রষ্টা, আদি বিজ্ঞানী, আদি চিকিৎসক, আদি শিল্পী ও কারিগর এবং আদি যোদ্ধা। মানব সমাজ কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চালক শক্তি।

ঈশ্বরচন্দ্রের কোন ভাবনা ও কাজ দেশের খাদ্য উৎ-পাদনের সাথে যুক্ত? কোন কাজ কৃষক তথা অন্নদাতাদের উৎসাহিত করে? ঈশ্বরচন্দ্রের কোন পদক্ষেপ মানুষের বস্ত্র ও বাসস্থান তৈরিতে সাহায্য করেছে?

খাদ্য উৎপাদনের দক্ষতার উপর নির্ভর করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানব জাতির ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কৃষকরা কেবল দেশের অন্নদাতার কাজই করেন শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে মানব সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

এই কৃষকদের সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের মূল্যায়ণ দেখুন! "বাল্যবিবাহের দোষ" নিরূপণে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, 'অন্যা-ন্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্য বিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই' (বিদ্যাসাগর রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা: ০৩)। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে সম্মান জানাতে গিয়ে তাঁর মনের কথা লিখেছেন, "এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম-হীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে ইহাদের বিপরীত ছিলেন" (রবীন্দ্রনাথ)। ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্ত-ব্যের উদ্দেশ্য যাই হোক দেশের মানুষ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের এই রূপরেখা বা চিত্রায়ণ ভুল ছিল না।

কি দাঁড়ালো এর অর্থ? এত দেশের আপামর জনসাধা-রণকে অসম্মানিত করে ঈশ্বরচন্দ্রের গুণকীর্তন। যা দেশের অন্নদাতা কৃষক ও কারিগর সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের হীন, অস-ম্মানকর মনোভাবের এ এক বিচিত্র বর্ণমালা!

যে দেশের তাঁত শিল্পীরা "সান্ধ্য শিশির" নামের মসলিন বুনতেন, তা কি তাঁদের যুগ যুগ ধরে আশ্চর্য্য দক্ষতা ও অপরিসীম মানসিক সামর্থ্যের ফসল নয়? যে কারিগরদের অপরিসীম মানসিক শ্রম ও যুগ যুগ ধরে অনুশীলনের চিহ্ন বয়ে নিয়ে চলেছে দক্ষিণের মন্দির থেকে উত্তরের তাজমহল! তাঁদের শ্রম, দক্ষতা ও শিল্পী মানসকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো কে দেশপ্রেম বলে না!

ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয় বইতে চাষী, কৃষক,তাঁতী-,কামার, কারিগর, কোদাল, কাস্তে, লাঙ্গল,মই, ইত্যাদি শব্দ গুলো নেই। "বোধদয়" এর শিক্ষামালা তো "ঔপনিবেশিক শিক্ষা আদর্শ" এর চর্চা ও প্রয়োগ। যা ব্রিটিশ রাজের স্থায়িত্বকাল বাড়িয়ে ছিল। দেশের মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে ছিলেন

সৌজন্য: সোসাইটি ফর সোসাল ফার্মাকোলজি, পশ্চিমবঙ্গ।

৩০ জুলাই ২০১৯। কলকাতা।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে; ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে ; আর দেশের মানুষ চোখ বুজে 'ভগবান' 'ভগবান' করবে - এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই; আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে"

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

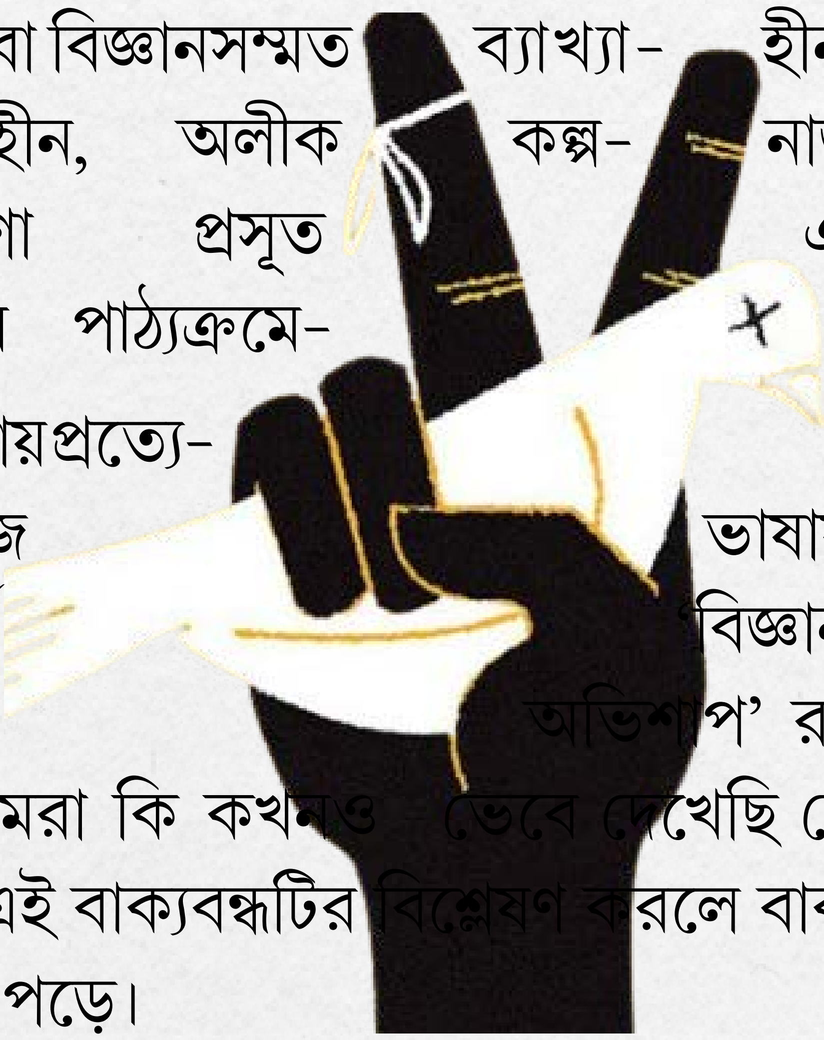
সূচিপত্র

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

লিখেছেন – তন্ময়

আশীর্বাদ ও অভিশাপ শব্দদুটির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, আশীর্বাদেও কারও হিতসাধন হয় না, অভিশাপেও কোনও ক্ষতিসাধন হয় না, তবুও শব্দদুটি মানবসমাজে বহুল প্রচলিত।

বস্তুনিষ্ঠ বা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাহীন, তথ্যভিত্তিক প্রমাণাদিহীন, অলীক কল্পনাজনিত ভাববাদী ধ্যানধারণা প্রসূত এই শব্দদ্বয় আমাদের পাঠ্যক্রমেরও অন্তর্ভুক্ত।



আমরা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা বা ইংরাজি ভাষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ' রচনাটি পড়েছি। কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে এই বাক্যবন্ধটির বিশ্লেষণ করলে বাক্যবন্ধটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অনেকে বলতেই পারেন, বাক্যবন্ধটিতে 'হিতকর' এবং 'ক্ষতিকর' অর্থে 'আশীর্বাদ' ও 'অভিশাপ' শব্দদুটি ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যকোনও উদ্দেশ্য নেই।

আমি বলব, তাও যদি হয় সেটাও ভুল এবং অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হল প্রকৃত সত্য থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়া।

বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার কার্যকরী নিয়মগুলি জানার অভিযানই হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কথার অর্থ পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্য-

ক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা নির্নীত ও শৃঙ্খলিত বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞান সদা জিজ্ঞাসু, সত্যসন্ধানী এবং মূলত নৈর্ব্যক্তিক।

তাই বিজ্ঞান নয়, রাষ্ট্রের ভুমিকার পর্যালোচনা করতে হবে, বিজ্ঞানীদের ভুমিকা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন গরীব ও প্রান্তিক মানুষের জীবন যাত্রার মান বাড়াতে সদর্থক ভূমিকা পালন না করে যদি নানা রকম অসুবিধা ও দুর্ভোগের সৃষ্টি করে তবে তার দায় রাষ্ট্রের, বি-জ্ঞানের নয়। বিজ্ঞানীরা যদি সামাজিক দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে কর্পোরেটদের হাতের পুতুল হয়ে সমাজের ক্ষতিসাধন করেন তবে তার দায় বিজ্ঞানীদের, বিজ্ঞানের নয়।

তাই, "বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ" কথাটাই ভুল। বিজ্ঞান হল গবেষণালব্ধ _জ্ঞানভাণ্ডার। সেই জ্ঞানভাণ্ডারে ডুব দিয়ে কে কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে তার দায়দায়িত্ব বিজ্ঞানের ওপর চাপানো হবে কেন?

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"মহৎ ব্যক্তিরা সব সময় ভয়ানক বাধার সম্মুখীন হয় সংকীর্ণ চিন্তার মানুষদের কাছে থেকে।"

- অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

সূচিপত্র

একশো দিনের কাজের প্রয়োজনীয়তা

লিখেছেন – দিলীপ দাস মণ্ডল

একশো দিনের কাজ সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার এবং গরীবদের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উত্তরণের সবচেয়ে সেরা হাতিয়ার। এই প্রকল্পকে বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উপরের সব শ্রেণী এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা অপরের শ্রমের স্বত্বভোগ করে জীবন চালায় তারা। এই শ্রেণীগুলীর লোক কিন্তু মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক কম। অর্থাৎ যারা একশো দিনের কাজের সুফল লাভ করবে তারা সমাজের অর্ধেকের বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় এই প্রকল্প রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক হয় না এবং কখনও কখনও যারা প্রকল্প বন্ধ করতে চায় তাদের সমর্থন করে ফেলে প্রকৃত কারণ না বুঝেই।



প্রকল্প বন্ধ করবার জন্য যে কারণগুলো দেখায় সেগুলোর মধ্যে (1) শ্রমিকরা কাজ করে না, বসে বসে টাকা নেয়। (2) জবসিটে ভুয়ো কর্মী নথিভুক্ত করে দুর্নীতি হয়। (3) পাটিবাজী হয় এবং ক্ষমতাধারীরা বিরোধীদের জব থেকে বঞ্চিত করে। (4) যে-কোন সরকারী কাজের মধ্যে থেকে যে সকল কাটমানি বের করার ফন্দি- ফিকির আছে সেগুলো কার্যকর হয়।

দুর্নীতি দুর করার জন্য যা করবার তার ব্যবস্থা নিতে হবে কিন্তু

কয়েকজন দুর্নীতিকারীর জন্য তাদের বহুগুণ বেশি শ্রমিককে কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ১০০ দিনের কাজে বর্তমানে (05/08/2022) দৈনিক মজুরি 200 টাকার মত। আর সরকারী পার্মানেন্ট চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা মাসে গড়ে কমপক্ষে 32000 টাকা আয় করে (P.F. বোনাস ইত্যাদি ধরে)।বছরের মধ্যে বিভিন্ন ছুটি বাদ ধরে সর্বোচ্চ 240 দিনের বেশি এরা কাজ করে না, অর্থাৎ মাসে 20 দিন কাজ করে। এদের দৈনিক মজুরি কমপক্ষে (32000÷20)= 1600 টাকা। অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজের মজুরির (1600 ÷200)= 8 (আট) গুণ। এরা ১০০ দিনের কর্মীদের আট গুণ কাজ করে কি?

আর এই শ্রেণীর লোকেরাই সবচেয়ে বেশি গসিপ করে সমাজের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর লোকের আয়ের রাস্তা বন্ধ করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারাও এদের সমর্থন করে প্রচার করছে যাতে ১০০ দিনের প্রকল্প ভালভাবে সমাজে কার্যকর না হয় তার লক্ষ্যে।

সমাজের শ্রমিক, কৃষক (বামুন চাষী ছাড়া), মজুর, ঝি, চাকর, কন্ট্রাক্টরের লেবার ইত্যাদি শ্রেণী যারা দৈনিক 200 টাকার থেকে কম বা অল্প কিছু বেশি পর্যন্ত আয় করতে পারছেন তারা সকলে মিলে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে একটি আন্দোলনে রূপান্তর করুন এবং যারই এই প্রকল্পে কাজ করার দরকার সেই যাতে এই কাজ পেতে পারেন তার চেষ্টা চালান এবং প্রশাসনকে এই কাজ দিতে বাধ্য করুন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা তার চাষ বা ছোট ব্যবসার জন্য অল্প কিছু কর্মীকে কাজ দেয় তাদের প্রায় সকলেই ১০০ দিনের কাজের বিরোধী। কারণ (1) তারা ফাটকা কর্মীর অভাব অনুভব করে। (2) তারা নিজের মর্জি মত শ্রমিকের রোজ (দৈনিক মজুরি) চাপিয়ে দিতে পারে না। (3) তারা নিজের মত করে সবচেয়ে দক্ষ এবং সক্ষম মজুর

পায় না। (4) শ্রমিকদের চাপ সৃষ্টি করে বেশি সময় ধরে কাজ আদায় করতে পারে না। এই সকল কারণ ছাড়া আরও অনেক কারণ থাকতে পারে ১০০ দিনের কাজের বিরোধী মানসিকতাধারীদের।

১০০ দিনের কাজের বিরোধীদের মানবিকতা এমন তলানিতে পৌছে গেছে যে, সেই সব মানুষরা যারা ১০০ দিনের কাজ করে (দৈনিক 200 টাকা মজুরিতে) যা হোক করে খাওয়া, পরা চালাচ্ছে, তাদের সেটুকুও বন্ধ করবার চেষ্টা করছে।

যারাই দৈনিক 200 টাকার উপরের আয়ের মত কাজ পাচ্ছেন না তারা সকলেই এককভাবে বা মিলিতভাবে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কাছে জানান যে আপনার ১০০ দিনের কাজ দরকার। ভোটের সময় যখন ভোট ভিক্ষা করতে আসে রাজনৈতিক দলের ক্যাডাররা তখন আপনাকে যাই সূযোগ করে দেবার কথা বলুক না কেন তখন আপনি অবশ্যই আপনাকে ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড করে দেবার এবং প্রকৃতই ১০০ দিন কাজ দেবার প্রতিশ্রুতি ক্যাডারের কাছে আদায় করে নেবেন। আপনি জানবেন আপনার মত ১০০ দিনের কাজ পেতে ইচ্ছুক সমাজের কোটি কোটি মানুষ, যে সংখ্যাটা যত লোক সরকারি চাকরি করে সেই সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।

যখন সকল ১০০ দিনের কাজের কর্মী মিলিতভাবে রাজনৈতিক দলের কাছে আর্জি জানাবে আর রাজনৈতিক দল আপনাদের আন্দোলনের প্রকাশ অনুভব করবে তখন সত্যি সত্যিই আপনাদের জন্য ১০০ দিনের কাজ সক্রিয় রাখতে বাধ্য হবে। মনে রাখবেন যারা আপনার কাছে ভোট চাইতে যাচ্ছে তারা প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এদের বেশীভাগ লোকই কিন্তু মনে মনে চায় না ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু থাকুক। আপনার সোচ্চার চাওয়াটাই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু রাখতে বাধ্য করবে।

সততা, নৈতিকতা কিংবা মানবিকতার অভাবই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ?

লিখেছেন – মাধব রঞ্জন সরকার

সততাই মহৎ গুণ, সততাই জীবনের মূলমন্ত্র, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ইত্যাদি বহুল প্রচলিত বাক্যগুলি আমরা সর্বত্র শুনে থাকি। এছাড়াও জনগণকে বলতে শোনা যায় সৎ মানুষজন দেশ পরিচালনা করলে দেশের এমন দুর্দশা হত না। অর্থাৎ সততা এমন এক যোগ্যতা যা দিয়ে সবকিছু জয় করা সম্ভব। এই রচনাটিতে আমরা সততার প্রচারিত দিক এবং প্রয়োগের বাস্তবিক দিক নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করব।



আমরা যদি কখনও নিজের ভেতরে উঁকি দিই তাহলে দেখব কখন আমরা অপরকে দুঃখ দিয়েছি অথবা দুঃখ দেবার কথা ভেবেছি। যখন সোজা পথে কাজ হয় না কেবলমাত্র তখনই বাঁকা পথ নিতে বাধ্য হয়েছি। একটি কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন ‘সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা

করে নিতে হয়’। এর অর্থ মানুষ প্রথমে সোজা আঙ্গুল দিয়ে ঘি বের করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে। তাতে যদি সফল না হয় তখন সংবিধানের বিপরীত পথ ধরে নেয়। সমাজে এইসব ঘটনাগুলিকে আমরা বিভিন্ন অপ-রাধের নামে জেনে থাকি। মানুষ সর্বকালে এভাবেই জীবন কাটিয়ে এসেছে। প্রথমে মানুষ সংবিধান অনুযায়ী জীবনযাপ-নের সাধ্যমত চেষ্টা করে। এমনকি সংবিধানের নিয়ম কঠোর হলেও মানুষ প্রথমে সেইমত চলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই সময়কালে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। তারপ-রও মানুষ চেষ্টা করে যায়। যখন সোজা পথে জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনই বিকল্প পথের সন্ধানে পা বাড়ায়। বলা যায় অপরাধের পথ গ্রহণ করে অগ্রসর হয়ে যায়। বর্তমান ব্যব-স্থায় এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যেখানে ১,০০০ মানুষের সুখসুবিধা প্রয়োজন সেখানে সুখসুবিধা রয়েছে কেবলমাত্র ১০ জন মানুষের জন্য। যেখানে ১,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান প্রয়োজন সেখানে কর্মসংস্থান রয়েছে কেবলমাত্র ১০ জন মানুষের জন্য। বর্তমান ব্যবস্থা ১০ জনকে কোনও প্রকারে কর্মসংস্থান প্রদান করলেও ৯৯০ জনকে ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের পরিস্থিতির উপর। সিংহভাগ মানুষ কিভাবে বেঁচে রয়েছে সে সম্পর্কে সকলে অবগত। দু-র্দশায় জর্জরিত মানুষ তারপরও যেমন তেমন করে দরিদ্র-তার সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু দরিদ্র অবস্থায়, অসহায় অবস্থায় কয়জন কতদিন সৎ হয়ে থাকতে পারে? প্রেমপূর্ণ মনোভাব কিংবা সততা বজায় রেখে চলতে পারে? হাতে গোনা কিছু মানুষ জর্জরিত অবস্থাতেও অন্যকে প্রতা-রণা করে না। তারা পরিত্যক্ত অবস্থা, জীর্ণ অবস্থা ভবিতব্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক গঞ্জনা ইত্যাদি চাপে মানুষ প্রতিনিয়ত হয় আত্মহত্যা করে চলেছে নাহয় মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে চলেছে। মনের দিক থেকে চাইলেও কেন সকলে সততা ধরে রাখতে পারে না? কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না? উত্তর হচ্ছে অর্থনৈ-তিক পরিস্থিতি বারংবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শতভাগ মানুষের

উচ্চতর আয়ের সুনিশ্চিত জীবিকার বন্দোবস্ত ব্যতীত শু-ধুমাত্র সততা বা নৈতিকতা দ্বারা কিভাবে জীবনযাপনের অভাব পূরণ সম্ভব? এইরূপ অসহনীয় অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ একটা সময় পর অনৈতিক পথ ধরে নিতে বাধ্য হয়। দেখা যায় সমাজ তাদেরকেই সরাসরি দোষারোপ করে থাকে। সমাজের এই অভিযোগ কি সঠিক বিচার বলে মনে হয়? কয়েকজন লোক মিলে তো সমাজ তৈরি হয় না। সমাজ সকলে মিলে তৈরি হয়। সেখানে শক্তিশালীরা থাকে, দুর্বলরা থাকে, শিশুরা থাকে, মহিলারা থাকে। বলার অর্থ সমস্তপ্রকার মানুষজন থাকে। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় সকলের কাছে নৈতিকতা কিভাবে আশা করা যায়? বরং নৈতিকতাকে একটি সঠিক ব্যবস্থার 'পরিণাম' অথবা 'মাপকাঠি' হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত। সততা বা নৈতিকতা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হলে বুঝতে হবে ব্যবস্থা সঠিক রয়েছে। অন্যথায় বুঝতে হবে ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও ত্রুটি রয়েছে। ব্য-বস্থা যখন সঠিক হয়ে যাবে পরিণামস্বরূপ নৈতিকতা স্বাভা-বিকভাবে চলে আসবে। নৈতিকতা বা অনৈতিকতা কোনও না কোনও ব্যবস্থারই পরিণাম। ব্যবস্থা ভাল হলে নৈতিকতা আপনিই চলে আসবে। জোর করে নিয়ে আসতে হবে না। বর্তমান ব্যবস্থা একইরকমভাবে চলমান থাকলে এটি নিশ্চিত যে ৯৯০ জন সুখসুবিধা থেকে সর্বদা বঞ্চিতই থাকবে। নিঃস্ব মানুষকে, বঞ্চিত মানুষকে, অসহায় মানুষকে কোন নৈতিক-তার পাঠ পড়াবেন?

তাকে পুনরায় কি ত্যাগ করার উপদেশ দেবেন? অনুস-ন্ধান করলে দেখা যাবে বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী নৈতিক ও মানবিক বলেই তারা বঞ্চিত, নিঃস্ব। মানবিকতা বা নৈতিকতা কোনও যোগ্যতা বা দক্ষতা নয় যা দিয়ে বাজার থেকে প্রয়ো-জনীয় বস্তু-পরিষেবা ক্রয় করা যায়। ব্যবস্থা একদিকে সুযো-গসুবিধা রেখেছে মাত্র ১০ জনের জন্য। অপরদিকে উপদে-শের বাণী শোনাচ্ছে সৎ হতে হবে, নৈতিক হবে হবে, মানবিক হতে হবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন মনোভাব রাখতে হবে। যেখানে পূর্বেই অনুমান করা যাচ্ছে ৯৯০ জন অসফল হবেই, প্রতা-

রিত হবেই। এইরূপ অমানবিক ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় ব্যক্তির সততা বা নৈতিকতাকে দোষারোপ করা যায়? দোষ তাহলে কোথায় রয়েছে? ব্যক্তির যোগ্যতায় নাকি অযোগ্য ব্যবস্থায়? সংশোধন কিসের প্রয়োজন? ব্যক্তির নাকি ব্যবস্থার? ১,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জনই যোগ্য এই সিদ্ধান্ত কতটা মানবিক? শুধুমাত্র যোগ্যতার মনোবলও কি ১০ জনের তালিকায় প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট? অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় যারা বাধ্য হয়ে কৌশল অবলম্বন করবেন তাদের অমানবিক বলবেন নাকি ব্যবস্থাকে অমানবিক বলবেন? ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংশোধন প্রয়োজন নাকি অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার রূপান্তর প্রয়োজন? ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেখানে শতভাগ মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা সর্বদা সুনিশ্চিত থাকবে। বিষয়টি ব্যক্তিগত নয় সামাজিক। সমাজকেই নতুন করে চিন্তন-মনন করতে হবে।

যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কৌশল অবলম্বন করে, মেধা-অর্থ-শ্রম-শক্তি ব্যয় করে সম্পদশালীদের মধ্যে যায়গা করে নিয়েছেন তারাও সর্বদা এই ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকেন যেকোনও সময় বঞ্চিতরা দল বেঁধে অর্জিত সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে। কারণ বর্তমান ব্যবস্থা সকলের জন্য সুযোগ-সুবিধা বা সম্পদের সুরক্ষিত বন্দোবস্ত করতে পারেনি। এমনকি বর্তমান দর্শনও মানুষের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন এমন সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট করে রেখেছে। নিঃস্ব, অসহায়, পরিত্যক্তদের কথা ছেড়েই দিন, যাদের দখলে কিছু না কিছু রয়েছে তারাও সর্বদা ভয়ে ভয়ে জীবন কাটাচ্ছেন।

এই প্রকার অস্পষ্ট দর্শন এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা চলমান থাকলে নিশ্চিন্তের জীবন হবে এমনটি কিভাবে আশা করা যায়? কঠোর সংগ্রাম কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে যে সামান্য কিছু মানুষ সুখসুবিধা অর্জন করেন কিংবা সমাজের চোখে তথাকথিত সফল বলে পরিচিত সেইসব মানুষজনও অর্জিত সম্পদ ঠিকমত উপভোগ করতে পারে না। কেননা তারা এই ভেবে সর্বদা দুশ্চিন্তায় থাকে কি জানি এই সুখ-সুবিধা কতদিন আমাদের কাছে থাকবে। কবে কে ছিনিয়ে নিয়ে

চলে যাবে কে জানে। কেননা বহু মানুষ লুণ্ঠনের চেষ্টায় প্রচেষ্টারত রয়েছে। কি জানি কখন তারা সফল হয়ে যায়। পরিবারের কাউকে অপহরণ না করে ফেলে। আত্মীয় বন্ধুদের উপরও সর্বদা সন্দেহ থাকে এই ভেবে কে কখন প্রতারণা করে ফেলে। কিংবা মামলা মোকদ্দমায় না ফেঁসে যেতে হয়। যে কারণে নিকটজনের সম্পর্কও একরকম সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলে। যেটুকু সুখসুবিধা তাদের কাছে থাকে সেটুকুও ভয়ে ভয়ে উপভোগ করতে হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত এটিই বেরিয়ে আসে পেয়েও অসুখী জীবন না পেয়েও অসুখী জীবন। অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা আবশ্যক যাদের কাছে সম্পদ রয়েছে তারাও যেন সুরক্ষিত জীবনযাপনের মাধ্যমে সুখ উপভোগ করতে পারে এবং যাদের কাছে কিছুই নেই তারাও যেন সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে সুখী জীবনযাপন উপভোগ করতে পারে।

সীমিত সুযোগ-সুবিধা দখল করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা পিছিয়ে পড়ে তাদের বহু উপমা দ্বারা ভূষিত করা হয়। বাস্তবে কেউই অলস অবস্থায় কিংবা অদক্ষ অবস্থায় পড়ে থাকতে চায় না। কেউই অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। প্রতিটি মানুষ আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন জীবনযাপন উপভোগ করতে চায়। পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও জীবিকার বন্দোবস্ত পেতে চায়। সকলেরই কোনও না কোনও বিষয়ে রুচি রয়েছে, মেধা রয়েছে। এমনকি পছন্দের কর্ম সম্পাদনেও আনন্দ আছে। সকলেই সেই আনন্দ উপভোগ করতে চায়। সুতরাং শতভাগ মানুষের সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত না করে কাউকে অলস, অনৈতিক ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করা আদৌ যুক্তিযুক্ত? এমনতর অবস্থা কি সততা বা নৈতিকতার অভাবের কারণে ঘটে চলেছে? অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাই একমাত্র দায়ী নয় কি? অনেকে পূর্বজন্মের কর্মফলকে দায়ী করেন এবং মানুষের মধ্যে জন্মগত পাশবিক প্রবৃত্তি রয়েছে এমনটি মনে করেন। প্রথমে এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক একটি শিশু পৃথিবীতে পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে আসে নাকি নিষ্পাপ অবস্থায় আসে। সে কি পূর্বজন্মের পাপ বয়ে নিয়ে আসে নাকি শুদ্ধ অবস্থায় আসে। নিজেদের পরিবারের সন্তানদের দেখে কখনও এমন মনে হয়েছে তাদের মধ্যে জন্মগত পাশবিক প্রবৃত্তি রয়েছে? নাকি প্রতিটি শিশু নিজের পরিবার, পরিজন, পরিবেশ, বাহ্যিক অবস্থা-ব্যবস্থা যেমন তেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে শেখে এবং সেই পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করে থাকে? তাহলে বাহ্যিক অসম্পূর্ণ অবস্থা-ব্যবস্থার রূপান্তর প্রয়োজন নাকি নিষ্পাপ মনের? তথাকথিত এই সিদ্ধান্তটি প্রচলিত আধ্যাত্মিক জগতের ভ্রান্ত ধারণা নাকি সঠিক সিদ্ধান্ত? এ বিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করা উচিত নয় কি? গবেষণা-অনুসন্ধান-আলোচনা-পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তই উঠে আসবে বাহ্যিক অবস্থা-ব্যবস্থার রূপান্তর আবশ্যক। যে কারণে ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এবার অপরাধের বিষয়টি নিয়ে সামান্য পর্যালোচনা করা যাক। একজন অপরাধীর ক্ষেত্রে সমাজ এই আশা করে সে যেন সঠিক শাস্তি পায়। ধরুন শাস্তি পেয়ে জেলবন্দি বা ফাঁসি হল। উপদেশ হিসেবে প্রচারও করা হল আর কেউ যেন অপরাধ না করে। করলে ওইরকম শাস্তি পেতে হবে। এতেই কি সব মিটে যায়? সমাজ কি অপরাধ মুক্ত হয়? অপর কেউ একইরকম অপরাধে লিপ্ত হয় না? যারা অপরাধ করে তারা কি জানে না ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি হবে কিংবা মৃত্যুও হতে পারে? তারপরও মানুষ কেন অপরাধে লিপ্ত হয়? কোন প্রবৃত্তি তাকে অপরাধের পথে প্রেরিত করে? কেন প্রেরিত করে? সেই প্রবৃত্তি কি অপরাধী জন্মজাত নিয়ে আসে? নাকি সমাজ থেকে গ্রহণ করে? তাহলে সমস্যা কি মনুষ্যের অভ্যন্তরে রয়েছে নাকি সমাজের মধ্যে রয়েছে? আপনারা যেকোনও একটি সমস্যা উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন প্রতিটি সমস্যা সরাসরি ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত।

সুতরাং বিষয়টি প্রথমত দর্শনগত, তারপর ব্যবস্থাগত। এটি নিশ্চিত মানুষের অভ্যন্তরে কোনও সমস্যা নেই। বাহ্যিক পরিস্থিতিই ধাপে ধাপে বাধ্য করে অনৈতিকতার পথে ঠেলে দেয়। যদিও বাস্তবে সামান্য কিছু মানুষ আছেন যারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অনৈতিক পথ গ্রহণ করেন না। তারা সমস্ত দুঃখ সহ্য করে চলেন। সৎ, মানবিক, নৈতিক মানুষের জীবন পরিত্যক্ত হবে, অসহায় হবে, জীর্ণ হবে এটিই বা কি প্রকা-রের বিধান? তাদের কি সুখসুবিধার প্রয়োজন নেই? দেখা যায় সৎ মানুষকে অধিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাদের পরিবারের সদস্যরাও এমন কষ্টের জীবন চায় না। নীতিবান মানুষদের বাড়ি গেলে দেখা যায় তাদের পরিবার কত দুঃখে রয়েছে। তাদের আত্মীয় পরিজনরাও এইসব নীতিবান মানু-ষদের তিরস্কার করতে থাকে। শিক্ষা, জীবিকা, সুখসুবিধার বন্দোবস্ত না হলে সততা, নৈতিকতা কিংবা মানবিকতা দ্বারা বাস্তবিক চাহিদার অভাব পূরণ কিভাবে সম্ভব হবে? মূল কথা সততা, নৈতিকতা কিংবা মানবিকতা কোনও যোগ্যতা বা দক্ষতা নয় যা দিয়ে সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন সম্ভব। নিষ্ঠা-বান, নীতিবান হয়ে আজীবন দুর্দশার জীবন ধারণ করে প্রাণ ত্যাগ করাও যেমন সঠিক বিধান নয় তেমনই সম্পদ অর্জন করে অসুরক্ষিত জীবনযাপনও সঠিক বিধান নয়। আবার ব্য-বস্থা যেমন তেমন নির্মাণ করে জনতা ভাল হলে ব্যবস্থা ভাল হবে এবং জনতা মন্দ হলে ব্যবস্থা বিফল হবে এটিও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। মানুষকে বাধ্য হয়ে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার নীতিকে মেনে নিতে হবে এটিও সঠিক বিধান নয়। মানুষ অন্তরে যেমন বাহ্যিক জগতের ব্যবস্থাও তেমন হওয়া উচিত। জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, মূর্খ, জ্ঞানী, দরিদ্র, বিত্তশালী সকলকে প্রথম সারিতে রেখে ব্যবস্থা নির্মাণ করা উচিত। এমন ব্যবস্থা আবশ্যক যেখানে প্রতিটি মানুষের সমৃদ্ধশালী জীবন আজীবন সুরক্ষিত থাকবে। মানুষ সমৃদ্ধশালী হলে, সুনিশ্চিত হলে, সু-রক্ষিত হলে পশু-পক্ষী-জলবায়ু-প্রকৃতি ইত্যাদি দিকগুলি-কেও সুরক্ষিত করা সম্ভব হবে। তবেই বাস্তবিক স্বাধীনতা তথা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে, সকলের মিলিত উদ্যোগে বাস্তবিক জীবনের সাথে সমন্বয় রয়েছে এমন কোনও দর্শনকে বিকিশিত করে একটি পূর্ণা-ঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কাছে সমস্ত প্রকার সুখ উপভোগের জন্য সঠিক বন্দোবস্ত থাকলে কেউই অনৈতিক পথ নির্বাচন করত না। কারোর কিছু হারানোর ভয় থাকতো না এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোপন অভিসন্ধি ইত্যাদির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হতো না। সকলের কাছে সমস্তরকম সুখসুবিধা বরাবর সুনিশ্চিত থাকতো। আমরা সকলে মিলেমিশে সম্পূর্ণরূপে সুখী জীবন উপভোগ করতাম। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান তত্ত্ব আমাদের কাছে এসেছে। দিল্লী নিবাসী দার্শনিক প্রেমজিৎ শিরোহী মহাশয় দীর্ঘ গবেষণা-অনুসন্ধান-পর্যালোচনার পর এমন এক দর্শন এবং এমন এক ব্যবস্থা জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন যার দ্বারা সকল প্রকার সুখসুবিধা সকলের জন্য স্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে। ULM সংস্থা এই নতুন ব্যবস্থার রূপরেখাটিকে বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজের কাছে প্রচার করে চলেছে। এই ব্যবস্থায় মোট ছ'টি মডেল রয়েছে। নতুন অর্থ-নীতি, নতুন রাজনীতি, নতুন সামাজনীতি, নতুন শিক্ষানীতি, নতুন পরিবারনীতি ও নতুন জীবন দর্শন। "সম্পূর্ণ সমাধান – এক নতুন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থার রূপরেখা" ও "সম্পূর্ণ জীবন দর্শন – এক নতুন দর্শনশাস্ত্রের রূপরেখা" নামক পুস্তকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি পুস্তকের ইবুক সকলের জন্য বিনামূল্যে অর্পণ করা হয়েছে। অন-লাইন-অফলাইন মাধ্যমে কাগজের পুস্তকও উপলব্ধ রয়েছে।

এবার একটিই কর্ম অবশিষ্ট রয়ে যায় তা হল এই ব্যবস্থাটিকে অধ্যয়ন করে বুঝে নেওয়া ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া। যেকোনও তত্ত্ব প্রয়োগের পূর্বে তত্ত্বগত দিক দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া আবশ্যক। এই সমাধান সঠিক বলে বিবেচিত হলে সমাজের উচিত দ্রুত এই ব্যবস্থাটিকে সকলের কাছে

পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারি স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস শুরু করা। আমরা জানি চলমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী জনগণ যে নীতিকে চাইবে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে। জনসাধারণের উচিত এই ব্যবস্থাটিকে সার্বিকভাবে যাচাই করে নেওয়া। যেমন এই ব্যবস্থা নিজের ও পরিবারের সমস্ত সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ কেন সমর্থন করবে, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিবর্গ কেন সমর্থন করবে, দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ কেন সমর্থন করবে, সকলের অর্থনৈতিক চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে, মুদ্রা কিংবা মুল্যাংকনজনিত সমস্যা কিভাবে নির্মূল করবে, আর্থিক দুর্নীতির সমস্যাটি কিভাবে নির্মূল করবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করবে, জনগণ এবং সাংবিধানিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সামঞ্জস্য কেমন থাকবে, বিপক্ষে রায় দেবার কোনও কারণ অবশিষ্ট থাকবে কিনা, এই ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, কারা প্রতিষ্ঠা করবে, কবে প্রতিষ্ঠিত হবে ইত্যাদি। যদিও 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব, আলোচনা, চিন্তন-মনন ইত্যা-দির জন্য ULM Bangla, ULM Hindi সহ অন্যান্য ভাষার ইউটিউব চ্যানেলে অনলাইন মুক্ত মঞ্চ রয়েছে। আপনারা যে স্থানে রয়েছেন সেই স্থান থেকেই অনলাইন আলোচনায় যুক্ত হতে পারবেন। ইতিমধ্যে বহু বিষয়ে আলোচনার অডিও-ভিডিও উপস্থাপন করা হয়েছে। সেসবও দেখে নিতে পারেন। বিষয়টি সামাজিক। তাই সিদ্ধান্তের বিষয়টিও সমাজের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের অংশগ্রহণ ও মতামত বিনিময় সমাজের সুখের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যে দেশ এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে সেই দেশের সকল নাগরিক ৫ বছরের মধ্যেই সমস্ত প্রকার সুখের অধিকারী হবে এবং অবিরত সকল প্রকার সুখ পেতে থাকবে। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গতানুগতিক বিপ্লব, আন্দোলন, সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির প্রয়োজন না পড়বে না। সকলের শি-ক্ষণ-প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, সমস্ত প্রকার সুবিধাযুক্ত আবাস, যাতায়াত, নিত্যদিনের বস্তু-পরিষেবা, ভ্রমণ-বিনোদন, সমস্ত

প্রকার সামাজিক সুখসুবিধাসহ সকল প্রকার নিরাপত্তা স্থায়ী-রূপে সুনিশ্চিত থাকবে। সমগ্র বিশ্ব এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে প্রতিটি দেশের নাগরিক সকল প্রকার সুখসুবিধা সহজেই উপভোগ করতে পারবে। সমস্ত দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের আদান প্রদান সহজ হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসান ঘটবে। এমনকি দেশের অভ্যন্তরেও লড়াই, দাঙ্গা কিংবা অরাজকতার সমস্যা উৎপন্ন হবে না। যুদ্ধ সামগ্রীতে বিনষ্ট হওয়া বিপুল সম্পদ মানুষের সুখসুবিধা বৃদ্ধির কাজে লাগবে। সুখসুবিধা পেতে আর অর্থের প্রয়োজন পড়বে না। এই ব্যবস্থার নতুন অর্থনীতি অনুযায়ী সকলে অর্থ ছাড়াই সরকারীভাবে সবকিছু পেতে থাকবে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে অনেকে সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থার তত্ত্বকে সমাজবাদ এবং সাম্যবাদের সাথে তুলনা করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ‘সম্পূর্ণ সমাধান’ এবং ‘সম্পূর্ণ জীবন দর্শন’ পুস্তক দুটি গভীরভাবে অধ্যয়নের পর তারা বুঝতে পারেন এই তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্বগুলির তুলনায় মূল স্থানেই পৃথক। দর্শনের তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত পৃথক, জীবনের উদ্দেশ্যজনিত ব্যাখ্যা পৃথক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পৃথক, রাজনৈতিক পরিকাঠামো পৃথক, রূপান্তরজনিত প্রক্রিয়া পৃথক ইত্যাদি। এর অর্থ এই নয় পূর্বের যা কিছু সঠিক রয়েছে তা বর্জন করা হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ সমস্ত প্রকার সামাজিক সুখসুবিধা প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা বরং এই তত্ত্বকে ‘ব্যক্তিবাদ’ নামে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি সরাসরি ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত। অপর কোনও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী সুস্থ্য নারী-পুরুষের যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী একটি জীবিকা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের জন্যও সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ্য, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি মানুষের জন্য কোনও প্রকার কর্ম সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সমস্ত প্রকার সুখসুবিধা স্থায়ীরূপে বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থায় কাউকেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অপরের উপর নি-

র্ভরশীল থাকার প্রয়োজন পড়বে না। ফলে কাউকেই গোপন অভিসন্ধির আশ্রয় নিতে হবে না। পারিবারিক অশান্তি স্থায়ী-রূপে নির্মূল হবে এবং সকলের সাথে সমস্ত সম্পর্ক স্থায়ীরূ-পে মধুর থাকবে। নতুন ব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত পুস্তক, অডিও-ভিডিও, বুকলেট, আর্টিকেল ইত্যাদি উপলব্ধ রয়েছে। বিষয়টি সামাজিক এবং জনগণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত। আলোচনা এবং মতামত আদান প্রদানের জন্য সকলে আম-ন্ত্রিত। ধন্যবাদ।

ইমেল- ulmbangla@gmail.com

ইউটিউব চ্যানেলে ও ফেসবুক পেজ- ULM Bangla

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার, বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি যা কিছু সবই ভাল – এরূপে বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনের খুব ঝোঁক, কোনপ্রকার সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনই আমল দেবেন না।”

(এখন ও তখন)

- প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সূচিপত্র

পরিবেশের জন্য এসি কতটা বিপদজ্জনক?

লি খে ছে ন – তা ঞ্জ ন বো স



এসি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর মূল কারণ ব্লা ব্লা নিয়ে ফেবুপাড়া সরগরম। যারা এসি ব্যবহার করে বা কেনার প্ল্যানিং করছে তাদের বলদা পাঁঠা বলেও অভিহিত করে ফেলছে কেউ কেউ। এসির বিরুদ্ধে মূলত দুটো অভিযোগ। ১) CFC ব্যবহার করা। যা পরিবেশের এবং ওজোন স্তরের পক্ষে ক্ষতিকর। ২) অত্যাধিক ইলেকট্রিসিটি খরচ।

আগে ১ নম্বর নিয়ে কথা বলি। প্রথমত এখন আর CFC বা R 12 ব্যবহার হয়না। যেটা ব্যবহার হয়, সেটা হল R134A. যেটা HFC. এর গ্রিন হাউস এফেক্ট CFC র তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি এসির কর্মপদ্ধতি দেখি, তাহলে দেখব যে এটি মূলত কাজ করে ইভ্যাপোরেশন পদ্ধতির উপর। কমপ্রেশরে হাই প্রেশারে তরলীকৃত রেফ্রিজারেন্ট বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে শুষ্ক এবং লো প্রেশারের হয়ে ইভ্যাপোরেটরে আসে। সেখানে লীনতাপ সংগ্রহ করে বাষ্পীভূত হয়। যেহেতু ইভ্যাপোরেটর বা লোকাল ভাষায় কুলিং কয়েল থেকে লীনতাপ সংগ্রহ করছে রেফ্রিজারেন্ট, এটি ঠান্ডা হয়ে যায়। এউ ঠান্ডা ইভ্যাপোরেটরে সংস্পর্শে এসে বাইরের হাওয়া ঠান্ডা হয় এবং

ব্লোয়ার মোটর সেই হাওয়াকে ঠেলে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ঠান্ডা ভারী হাওয়া নিচে নেমে যায়। গরম হাল্কা হাওয়া উপরে উঠে আসে। সেটা আবার এসিতে রিসার্কুলেট হয়ে ঠান্ডা হয়। মোটামুটি সহজ ভাষায় এসির মূল কর্মপদ্ধতি এটাই।

এখন দেখার জিনিস যেটা সেটা হল রেফ্রিজারেন্ট পুরো সময়-টাতেই একটা ক্লোজ সিস্টেমের ভিতর থাকছে। কোনভাবেই ওপেন এয়ারের সংস্পর্শে আসছে না। ফলত ওজোন স্তরে ক্ষতি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধির চান্স নেই যতক্ষন না রেফ্রি-জারেন্ট লিক হয়। এবার এই লিকেজের অনেক কারণ আছে। যার সিংহভাগ কারণই হল ঠিকঠাক মেনটেনেন্স না করা আর মিস হ্যান্ডেলিং। অর্থাৎ একটু নিজে সতর্ক থেকে রেগুলার সার্ভিসিং করালেই অন্তত লিকেজের চান্স ৯০ শতাংশ কমে যায়।

দ্বিতীয়ত হল বিদ্যুৎ খরচ। একটা বড় সাইজের ঘর এই গরমে স্বস্তিদায়ক রাখতে দুটো থেকে তিনটে ফ্যানের দরকার পড়ে। এরকম অবস্থায়, বিদ্যুৎ খরচও বেড়ে যায়। এবার কেউ যদি এসি ২৪ এ চালায় তাহলে কিন্তু ইলেকট্রিক খরচ অনেক কমে যায়। কিন্তু সেটা না করে গরমে ১৭ য় চালিয়ে কম্বল গায়ে দিলে ইলেকট্রিক খরচ বাড়বেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দুটো অভিযোগ আসে এসির বিরুদ্ধে, সামান্য কনসাসলি ব্যবহার করলেই দুটোই এড়ানো সম্ভব।

এবার একটা মজার গল্প বলি। এই R134A ব্যবহার করে ইভ্যাপোরেশন সিস্টেমে ঠান্ডা আরও একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসও করে। সেম টু সেম প্রশেস। অনেকের ঘরেই এসি না থাকলেও এই যন্ত্রটি থাকেই। এর নাম রেফ্রিজারেটর। অর্থাৎ আমার আপনার আদরের ফ্রিজ। হপ্তার বাজার, জল, আগের রাতের বেচে যাওয়া খাবার রাখার এক এবং একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেউ সরব হয়না। ফ্রিজের ঠান্ডা জল বা শরবত খেতে খেতে ফ্যানের তলায় বসে এসি ব্যবহারকারীর দ্বিচারিতা হল না কি ?

এইসব ব্যক্তিগত এসি বন্ধ, বাড়ির ছাদে গার্ডেনিং, বৃক্ষরোপণ এগুলো কোনটাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র নয়। এইসব এসি বন্ধ, রুফ গার্ডেনিং আদতে বন্যার সময় মগ দিয়ে জল সেঁচার মতন। কাজের কাজ কিছুই হয়না। শুধু সেল্ফ ইগো বুস্টিং ছাড়া। আপনি হয়ত এসি ব্যবহার করবেন না। গরমে পচে আদর্শের পিঠ চাপড়ানি দেবেন নিজেকেই। অথচ সার্ভার ঠান্ডা রাখার উদ্দেশ্যে আপনার বাড়ির পাশের ফাঁকা এটিএমে ২৪ ঘন্টা এসি অন থাকবে। অথচ সেই ব্যাপারে আপনি স্পিকটি নট। জলার পর জলা বুজিয়ে ফ্ল্যাট হচ্ছে, কলকারখানায় ঝেড়ে এসি ব্যবহার হচ্ছে। তারমধ্যে অনেক-গুলোই আদ্যিকালের CFC সমৃদ্ধ। ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমার কোন লক্ষন নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত এসি বন্ধ আর রুফ গার্ডেনিং এর গল্প আপনার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। এই ঢোকাটা স্বাভাবিক না কৃত্রিম সেই নিয়ে ভাবনার সময় এসে গেছে। ইচ্ছা করে নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে এসব প্রোপাগাণ্ডার চাষ করে জনসাধারণকে গিল্ট ট্রিপ দেওয়া হচ্ছে না তো!

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“One of the first conditions of happiness is that the link between man and nature shall not be broken.”
—Leo Tolstoy

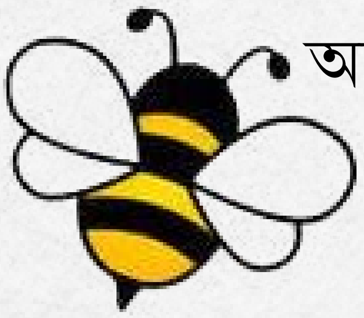
সূচিপত্র

মৌমাছি সমাজে শ্রমিকরাই চালিকাশক্তি, তাদের জীবন চলে ঘড়ি মেপে, অঙ্ক কষে,- কাজ করে আর নেচে গেয়ে

লিখেছেন – পঞ্চানন মণ্ডল

‘মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি দাঁড়াও না একবার ভাই।

ওই ফুল ফোটে বনে, যাই মধু আহরণে, দাঁড়াবার সময় তো নাই...’



মৌমাছির জীবনে আছে অসম্ভব ব্যস্ততা। আমরা মানু-ষরাও কম ব্যস্ত নই। কিন্তু অনেক প্রকৃতি প্রেমিক, গবেষক, বিজ্ঞানী আছেন যারা দিনরাত এক করে মৌমাছির জীবন রহস্য সম্ব-ন্ধে অনেক কিছু আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছেন। তবে আমাদের অনেকের মৌমাছির কাছে যাওয়ারও সাহস হয়না তাদের হুলের কারণে। তারপরও রাস্তা ঘাটে মৌচাক দেখলে আমাদের অনেকের কেন যে ঢিল ছুঁড়তে ইচ্ছে করে, কে জানে! এমনিতে মৌমাছি কখনও বিনা কারণে কাউকে আক্রমণ করে না, এরা খুবই শান্তি-প্রিয় প্রতঙ্গ। কিন্তু অস্তিত্বের প্রশ্নে কোন ছাড় নেই, তখন এরা এদের একমাত্র অস্ত্র হুল প্রয়োগ করতে এরা দেরি করে না।



মৌমাছি খুবই পরিশ্রমী, দলবদ্ধ এবং নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক

প্রাণী। এদের জীবন চলে ঘড়ি মেপে, অঙ্ক কষে! এদের সমাজে সবার কাজ নির্দিষ্ট, চেইন অফ কমান্ড এর বিন্দুমাত্র নড়চড় হয় না কখনও; হয় না কোন বিদ্রোহ। এখানে দুর্বলের কোন স্থান নেই, অত্যাচারীও নেই এখানে। নিজ দায়িত্ব পালনে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এরা পিছপা হয় না কখনই। কঠোর পরিশ্রমী, আত্ম-ত্যাগ ও নিষ্ঠাই এদের ৩০ মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রেখেছে।

মৌমাছির সবচেয়ে আকর্ষণীয় কিংবা অসাধারণ গুণের কথা বলতে হলে প্রথমেই বলতে হবে মৌ নৃত্যর (bee dance) কথা। তবে এ নাচ তো শুধুই নাচ নয়, এ তাদের ভাষা। এই নাচের মাধ্যমেই মৌমাছিরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে, খবরাখবর আদান প্রদান করে থাকে, তার সঙ্গে করে খাবারের সন্ধান। মৌমাছির এই অদ্ভুত কম্যুনিকেশনের পদ্ধতি উদ্ভা-বন করেন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিশ। তাঁর জন্য তিনি ১৯৭৩ সালে পান নোবেল পুরস্কার।

তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে দেখান যে, মৌমাছি নাচ এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে, খাবারের সন্ধান পায়।

খাদ্য সন্ধানকারী কর্মী বা শ্রমিক মৌমাছিরা প্রধানত দুই ধরনের মৌ নৃত্য করে থাকে, বৃত্তাকার বা চক্রাকার নৃত্য ও ওয়াগল নৃত্য।

বৃত্তাকার বা চক্রাকার মৌ নৃত্য-

খাদ্যের উৎসের দূরত্বের উপর নির্ভর করে খাদ্য সন্ধানে শ্রমিক মৌমাছিরা এই নৃত্য প্রদর্শন করে। খাদ্যের উৎস কাছাকাছি মানে ১০০ মিটারের মধ্যে হলে এই প্রকার নৃত্য প্রদর্শিত হয়। খাদ্য সন্ধানী মৌমাছিদের পিছনে সংগ্রাহক মৌমাছিরাও তখন ধাবিত হয় ও তারাও একই রকমভাবে নাচতে থাকে। চক্রা-

কার নৃত্য নিকটবর্তী স্থানে খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যকে জানাতে এবং পক্ষান্তরে সেই উৎস থেকে মৌমাছিকে খাদ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

ওয়াগল ডান্স বা ওয়াগল নৃত্য-

ইংরেজি ওয়াগল শব্দের অর্থ আন্দোলন বা কম্পন। খাদ্যের উৎস বেশি দূরে হলে মানে ১০০ মিটারের বেশি হলে কর্মী মৌমাছিরা এই প্রকার নৃত্য প্রদর্শন করে। এই নৃত্য ইংরেজি 8 সংখ্যার মত আকৃতির মতো হয়। এরা একবার ডান দিকে ও একবার বাঁদিকে ফাঁস বা লুপ তৈরি করে এবং নাচের সময় লুপ এর মধ্যে সরলরৈখিক অংশে সন্ধানী মৌমাছি ওপর-নিচে নিজেকে আন্দোলিত করে আর খাদ্যের উৎসের দিকে ধাবমান হয়।

ওয়াগল বৃত্তের সমীকরণ এর মাত্রা থেকে খাদ্যের অবস্থা-নের দূরত্ব সম্পর্কে মৌমাছি জানতে পারে। সূর্যের সাপেক্ষে নৃত্যের কৌণিক অভিমুখ থেকে খাদ্যের উৎস এর দিক নি-র্ধারণ করে। ঊর্ধ্বমুখী নৃত্য থেকে বোঝা যায় যে খাবারের উৎস এর অবস্থান সূর্যের দিকে এবং নিম্নমুখী নৃত্য থেকে বোঝা যায় যে খাবারের অবস্থান সূর্যের বিপরীত দিকে।

অর্থাৎ মৌমাছির রয়েছে অসাধারন দিক জ্ঞান এবং নিখুঁত দূরত্ব মাপার ক্ষমতা। কোন মৌমাছি যখন খাবারের অথবা মধুর নির্যাসের(মানে মকরন্দ বা নেকটার) কোন উৎস (ফুল) খুঁজে পায় তখন সে মৌচাকে এসে নৃত্যের মাধ্যমে সকলকে খবর দেয়। সে শরীর দোলাতে থাকে এবং নাচতে থাকে এমন এক পথ ধরে যার মাধ্যমে সে উৎসের দিক বোঝাতে পারে। এরা এই দিক ঠিক করে সূর্যের সাপেক্ষে যাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক বোঝা যায়।

মৌমাছির নৃত্যের সময়ব্যাপ্তি এবং কম্পনের (দোলা) সংখ্যা দিয়ে সে বোঝায় ঠিক কত দূরে আছে ফুল এবং ফুলে কি পরিমাণ মধুর নির্যাস রয়েছে, যেমন ১ সেকেন্ডের দোলন বোঝায় উৎস রয়েছে ১ কিমি দূরে।

এসব তথ্য এবং সূর্যের গতিবিধি'র নিখুঁত হিসেব করে মৌমাছিরা ফুল/খাবার এর কাছে পৌঁছানোর নুন্যতম ও সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত দূরত্ব বের করে ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, মৌমাছির এই সকল হিসেবের দক্ষতা খুব বেশি এবং সময়ও লাগে কম। উল্লেখ্য মৌমাছি সূর্যের আলোর হিসেব করতে পারে এবং পৃথিবী গোল হওয়ায় যে বক্রতার একটা ব্যাপার আসবে তাও তাদের নাচের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

মৌমাছি সূর্যকে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করে চলাফেরা করে।

তাই যখন আকাশ মেঘলা থাকে, সূর্য মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায়, তখন এরা এদের বিশেষ আলোক-গ্রাহক (ফটো-রিসে-প্টর) ব্যবহার করে পোলারাইজড আলো কাজে লাগিয়ে সূর্যের সঠিক অবস্থান বের করে ফেলে। এজন্য অতিবেগুনী (আল্ট্রা-ভায়োলেট) আলোরও সাহায্য পড়ে, সে ক্ষমতাও আছে এদের। এছাড়াও সূর্য আবার সবসময়ে সব ঋতুতে আকাশের এক জায়গায় থাকে না! তাতেও সমস্যা নেই! কারণ, মৌমাছির মাথায় আছে প্রাকৃ-তিক ঘড়ি! যার মাধ্যমে এরা সূর্যের গতিবিধি সবই হিসেব করতে পারে।



মৌমাছিরা গাছের ডালে বা কার্নিশে বড়-বড় চাক তৈরি করে। প্রতি চাকে ৩০ হাজার থেকে ৮০ হাজার মৌমাছি থাকতে পারে। এক-একটি চাকে এত-এত মৌমাছি থাকলেও তাদের নিজেদের মধ্যে ঝুট ঝামেলা করতে বা

মারামারি করতে দেখা যায় না। অবশ্য সময়ে অসময়ে এক চাকের মৌমাছি অন্য চাকের মৌমাছিগুলিকে আক্রমণ করে লুঠতরাজ করবার চেষ্টা করে থাকে। মৌমাছিরা ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরোয়া না করে সমাজের স্বার্থে কাজ করে যায়। এমনকি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হয় না। মৌমাছিরা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের দি-নযাপন করে।

এরা শীতকালে তেমন কাজ করে না। সারা শীতকালটা এরা সঞ্চিত মধুর উপর নির্ভর করে কাটায়। কিন্তু বসন্তের আগমনে এরা পুরোনো ছন্দে ফেরে। মধু আহরণ, চাক নির্মাণ, বাচ্চা প্রতিপালন, বাসার আবর্জনা পরিষ্কার বলুন আর শত্রুদের সামলানো বলুন যেভাবে অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও তৎপরতার সাথে কাজ করে, তা দেখলে আপনি বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। প্রত্যেকের কাজ ভাগ করা, কেউ কারোর কাজে বাধা সৃষ্টি করে না। সবাই যেন নিজ নিজ কাজের প্রতি দায়বদ্ধ। যেন কিছুটা রোবটের মতো কাজ করে যাচ্ছে। দেহ মনে কোনও ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অন্যের উপর দোষারোপ নেই।

একটি মৌচাকের মৌমাছিকে আমরা দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি – অত্যন্ত কর্মপটু শ্রমিক মৌমাছি আর ওপর দল সম্পূর্ণ কর্মবিমুখ রানি ও পুরুষ মৌমাছি। আগেই বলেছি শ্রমিকরা চাক নির্মাণ, মকরন্দ সংগ্রহ, মধু তৈরি, বাচ্চা প্র-তিপালন, বাসা রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শত্রুদমন সবই করে। পুরুষরা মৌমাছি প্রধানত আহার-বিহারেই মত্ত থাকে। আর রানী মৌমাছির বংশবৃদ্ধি ছাড়া কোনও কাজ নেই। পুরুষেরা প্রায়ই দিনের শেষভাগে উচ্চ শব্দ করে বাসা থেকে উড়ে যায় এবং কিছুক্ষণ প্রমোদ ভ্রমণ করে বাসায় ফিরে আসে। প্র-ত্যেক চাকে সাধারণত একটি মাত্র পরিণত বয়স্ক রানি মৌমাছি দেখা যায়। মৌমাছিদের সামাজিক কার্যকলাপ দেখলে মনে হবে – একটিমাত্র রানীকে ঘিরেই তাদের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবে রানি বলে সে যে সবাইকে শাসনে রেখেছে

এমনটি ভাববেন না। এদের মধ্যে রাজতন্ত্র বা রাণীতন্ত্র বলে কোনও কিছুই নেই। রানির একমাত্র কাজ প্রজনন। একটি মাত্র রানিই চাকের প্রায় অধিকাংশ মৌমাছির মাতা। ডিম পারা আর আর পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে বৈবাহিক উড্ডয়নরত অব-স্থায় যৌন মিলন ছাড়া তার তেমন কোনও কাজ নেই। তাই শ্রমিক মৌমাছি আছে বলে মৌচাক আছে, মৌমাছির সমাজ টিকে আছে। মৌমাছি সমাজে রানি বা কোনও রাজা নয় শ্র-মিকরাই চালিকাশক্তি। আর তাদের জীবন চলে ঘড়ি মেপে, অঙ্ক কষে,কাজ করে আর নেচে গেয়ে।

সূচিপত্র

ভগৎ সিং ও তাঁর চিন্তাভাবনা

লিখেছেন – মঞ্জুশ্রী সামন্ত



'কীর্তি' পত্রিকার ১৯২৮- এর সংখ্যায়, ভগৎ সিং দু'টি নিবন্ধ লিখেছিলেন। একটি নিবন্ধের শিরোনাম হল, 'অচ্ছুৎ কা সাওয়াল', যা অস্পৃশ্যতাকে কেন্দ্র করে লেখা। আর অন্য নি-বন্ধের শিরোনাম হল, 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গে অর উনকা ইলাজ', যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার সমাধান নিয়ে লেখা। ভগৎ সিং ১৯২৮'এ যা লিখেছিলেন, বর্তমান সময়েও তা প্রাসঙ্গিক। যা প্রমাণ করে এসব প্রশ্নের সমাধানের জন্য খুব অল্পই কাজ হয়েছে। লেখাটি লিখতে গিয়ে প্রথমেই ভগৎ সিং লিখেছেন, "আমাদের দেশটি অনন্য, যেখানে ছয় কোটি নাগরিককে অস্পৃশ্য বলা হয়। তাঁদের সামান্য স্পর্শ, উচ্চ বর্ণের মানুষকে অপবিত্র করে দেয়। তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতারা ক্ষুব্ধ হন। বিংশ শতাব্দীতে এসবের চর্চা লজ্জাজনক। আমাদের দেশ নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক বলে দাবী করে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সমান অধিকার মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে। বস্তুবাদী ইউরোপ কয়েক শতাব্দী ধরে বিপ্লবের কথা বলছে। আমেরিকা এবং ফরাসি বিপ্লবের সময়, তাঁরা সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। অথচ, আমরা এখনও বিতর্ক করছি যে অস্পৃশ্যরা পৈতের অধিকারী কিনা, বা তাঁরা বেদ পড়তে পারবে কিনা। বিদেশে আমরা ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলছি যে, ইংরেজরা ভারতে আমাদের সমান অধিকার দেয় না।" ভগৎ সিং আমাদের পরিস্থিতি দেখে

ভাবলেন, এই ধরনের বিষয়ে আসলেই কি অভিযোগ করার কোনও অধিকার আছে? তিনি এই অস্থিরতার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে সত্যিই নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের সবার প্রথম সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত: "বিশ্বাস করতে শুরু করা উচিত যে, আমাদের সবার জন্ম এবং পেশা সমান অধিকার নিয়ে। সেখানে বি-ভক্তিকরণের কোনও প্রয়োজন নেই। যদি কেউ একজন ঝাড়ুদারের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তার মানে এই নয় যে সারা জীবন তাঁকে আবর্জনা পরিস্কার করে পারিবারিক পেশা বজায় রাখতে হবে, কোনও উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর অংশ-গ্রহণের অধিকার নেই।"

এই ধরনের বৈষম্য সরাসরি দায়ী ছিল ধর্মান্তরের জন্য। যা ১৯২০'র দশকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। তিনি নিজে ঔপনিবেশিকতার বিরোধী হয়েও, শুধু মিশনারিদের নিন্দা করেননি, বা যাঁরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের হত্যা ও পুড়িয়ে ফেলার জন্য হিন্দুদের প্ররোচিত করেননি। তিনি স্ব-সমালোচনামূলকভাবে লিখেছেন: "আপনি যদি তাঁদের সাথে পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁরা অন্যান্য ধর্মে যোগদান করবেন। যে ধর্মে তাঁরা অনেক বেশি অধিকার পাবে এবং যেখানে তাঁদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করা হবে। এই পরিস্থিতিতে খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম হিন্দু ধর্মের ক্ষতি করেছে বলে অভিযোগ আনলে তা বৃথা হবে।"

সূচিপত্র

অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে ৫০ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ

লিখেছেন - সন্তোষ শর্মা

প্রবীর ঘোষ নিজের ‘অলৌকিক নয়, অলৌকিক’ বইতে একটি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাকে ৫০ লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব। আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি প্রবীর ঘোষ-এর ৭ এপ্রিল ২০২৩-এ মৃত্যু হয়। ওনার মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠছে, প্রবীর ঘোষের ৫০ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ কি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এগিয়ে নিয়ে যাবে নাকি চ্যালেঞ্জ বন্ধ করে দেবে?

যুক্তিবাদী সমিতিতে কি প্রবীর ঘোষের বিকল্প নেই, যে ওনার মতন চ্যালেঞ্জ করে অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদারদের মুখোশ খুলে আবারও প্রমাণ করে দেবে, অলৌকিক বলে বাস্তবে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, সবই লৌকিক। এই ধরনের প্র-শ্নের উওর জানাতেই আমার এই লেখা। আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে ৫০ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ।

আমি সন্তোষ শর্মা, পিতা - রামপ্রবেশ শর্মা, নিবাস - জাফর-

পুর, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, কলকাতা- ১২২

নিম্নলিখিত ঘোষণা রাখছি -

বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শু- ধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যেকোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাকে ৫০-লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

এই ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে:

১। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

২। যোগের সাহায্যে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করার কোনও দাবিদার যদি আমার দেওয়া রোগীকে ১ বছরের মধ্যে রোগমুক্ত করতে পারেন।

৩। যোগের সাহায্যে পাখির মত শূন্যে উড়ে দেখাতে হবে।

৪। রেইকি ক্ষমতায় অথবা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার তরফ থেকে হাজির করা রোগীকে ১৮০ দিনের মধ্যে রোগমুক্ত করতে হবে। মৃত্যুর দায় পুরোপুরি বহন করতে হবে রেইকি মাস্টার বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে।

৫। যোগের সাহায্যে জরাকে আটকে রাখতে হবে।

৬। যোগের সাহায্যে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দেখাতে হবে। (ট্রেনে কাটা পড়েও বেঁচে থাকলে বেশ দেখার মতো ব্যাপার হবে।)

৭। যোগের সাহায্যে সুক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে হবে।

৮। অচল টেপ রেকর্ডারকে, রেডিওকে রেইকি ক্ষমতার দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সচল করতে হবে যেমনটা দাবি করে থাকেন কিছু রেইকি গ্র্যাণ্ডমাস্টার। ৯। ফেংশুই’-এর অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে হবে।

১০। আমার দেওয়া চারজন ভারতবিখ্যাত মানুষের মৃত্যু সময় আগাম ঘোষণা করতে হবে।

১১। যোগে পদ্ধতির সাহায্যে টাকে চুল গজিয়ে দিতে হবে।

১২। আমার তরফ থেকে হাজির করা ছবির মেয়েটিকে ১৮০ দিনের মধ্যে বশীকরণ করে প্রমাণ করতে হবে ফটো সম্মা-হেন’-এর অস্তিত্ব।

১৩। আমার দেওয়া কোনও ছেলে বা মেয়েকে সরস্বতী কবচ’ দিয়ে বা অলৌকিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম করাতে হবে।

১৪। প্রজাপতি কবচে বা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

১৫। আমার তরফ থেকে হাজির করা মামলা জেতাতে হবে।

১৬। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীনাকে জননী করতে হবে। সন্তানহীনাকে হাজির করব আমি।

১৭। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে যৌন-অক্ষমকে যৌ-নক্ষমতা দিতে হবে।

১৮। বাস্তুশাস্ত্র’-এর সাহায্যে লকআউট কারখানা খুলে লাভের মুখ দেখাতে হবে।

১৯। প্ল্যানচেটে আত্মা আনতে হবে এবং তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর করবো আমি।

২০। সাপের বিষ কোনও কুকুর বা ছাগলের শরীরে ঢুকিয়ে দেবার পর তাকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করতে হবে।

২১। বিষপাথরের বিষশোষণ ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

২২। কঞ্চি চালান, বাটি চালানের সাহায্যে চোর ধরে দিতে হবে।

২৩। থালা পড়ার সাহায্যে বিষ নামাতে হবে।

২৪। নখদর্পণ প্রমাণ করে চোর ধরে দিতে হবে।

২৫। চালপড়া খাইয়ে চোর ধরে দিতে হবে।

২৬। যোগেবলে শূন্যে ভাসতে হবে।

২৭। যোগেবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখতে হবে।

২৮। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হতে হবে।

২৯। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানতে হবে।

৩০। অলোকিক বা যোগবলে জলের ওপর হাঁটা।

৩১। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি ও ভিডিও তোলা যায়।

৩২। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৩৩। মন্ত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে হবে।

৩৪। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

৩৫। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

৩৬। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

৩৭। ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ভূত এনে দেখতে হবে যার ভিডিও রেকডিং করা যাবে।

৩৮। মিডব্রেনের সাহায্যে আমরা দেওয়া কোনও জিনিসের সঠিক বিবরণ দিয়ে হবে।

৩৯। ওঝা, তান্ত্রিক, জনগুররু ও মাঝিকে প্রমাণ করতে হবে, ডাইনি বলে কোনও কিছুর বাস্তবে অস্তিত্ব আছে।

৪০। ডাইনির কু-নজরে কি পশু-পাখির মৃত্যু হতে পারে, প্রমাণ করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে:

১| আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন, বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাকে আমার কাছে, আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসেবে এক লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তার জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেইসঙ্গে যারা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য এগোতে চান, তাদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যা-লেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগে করতে পারবেন।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবি প্রমাণ করতে না পারলে, তার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত এবং শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৮। পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষ-

মতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন যোগী, রেইকি-গ্র্যাণ্ডমাস্টার, ফেং শুই বিশেষজ্ঞ, বাস্তুবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণীন ও উপাসনা-ধর্মের গুরুরা দাবি করেন। পত্র-পত্রিকায়, টিভি, সোসিয়াল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করেন।

প্রবীর ঘোষ অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের মুখোশ খুলে দিল বারে বারে প্রমাণ করেছেন অলৌকিক বলে বাস্তবে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, সবই লৌকিক। এবার আমি সন্তোষ শর্মা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদেকে ৫০ লাখ টাকার খোলা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। কেউ যদি অলৌকিকতা প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তাকে ৫০ লাখ টাকা দেওয়া হবে। এই চ্যালেঞ্জে আমার মৃত্যুর বা অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“দাবি সমর্থনে প্রমাণ করার দায়িত্ব দাবিদারের। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণের দায়িত্ব আস্তিকের এবং জ্যোতিষে বিশ্বাসীদেরই। যুক্তি ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসীরা সেই দাবির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই তা গ্রহণ করবে, এটাই তো সঙ্গত।”

-প্রবীর ঘোষ

সূচিপত্র

লং লিভ প্রবীর ঘোষ

লিখেছেন – চিত্রদীপ সোম

১৯৯৯ সালে প্রথম দেখা। ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র তখন আমি। বাড়িতে লুকিয়ে বর্ধমান থেকে গিয়েছিলাম তাঁর সাথে দেখা করতে, বর্ধমানে যুক্তিবাদী সমিতির শাখা খোলার ব্যাপারে অনুমতি নিতে।

আর আজ, একটু আগে তাঁর শেষযাত্রার সঙ্গী হলাম। দেহদান করে আসা হলো সাগর দত্ত হাসপাতালে। অবসান হলো একটা যুগের। একটা অধ্যায়ের।

আমার কাছে আজীবন গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে এই বিষয়টি যে তাঁর শেষযাত্রার সঙ্গীদের অন্যতম ছিলাম। আক্ষরিক অর্থেই শেষ মুহুর্ত অবধি সাথে ছিলাম তাঁর। মাঝপথে হাত ছেড়ে দিইনি আরও অনেকের মতো।

প্রবীর ঘোষ। শুধু একটা নাম নয়, একটা কিংবদন্তী। উপমহাদেশের বস্তুবাদ চর্চার সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। সবচেয়ে আলোচিত নাম। আপামর মানুষের কাছে যুক্তিবাদ শব্দটিকে জনপ্রিয় করার, ভাববাদী চিন্তার বিরুদ্ধে পালটা মগজধোলাইয়ের মূল কারিগর। আজও শুধু তাঁর নামটাই এক আতঙ্ক বাবাজী মাতাজী জ্যোতিষীদের কাছে। জীবিতকালে ফাঁস করেছেন অসংখ্য বাবাজী মাতাজী জ্যোতিষীর ভণ্ডামী। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে বারবারই উঠে এসেছেন তিনি। খোদ বিবিসি তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে তথ্যচিত্র বানায় সেই ১৯৯২ সালে। এছাড়াও দেশ বিদেশের বহু বিখ্যাত চিন্তাবিদদের আলোচনায় বারবারই উঠে এসেছেন তিনি। ভাববাদ,

ঈশ্বরতত্ত্ব, জ্যোতিষ সহ বিভিন্ন বুজরুকির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন বলিষ্ঠ হাতে। লিখেছেন প্রায় পঞ্চাশটির মতো বই, যার অনেকগুলিই বেস্ট সেলার আজও। নবনীতা দেবসেন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ'সহ বিভিন্ন লেখক লেখিকা তাঁর আদলে গল্পের নায়ক বানিয়ে গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর লেখা অবলম্বনে হয়েছে জনপ্রিয় সিরিয়ালও।

কেন প্রবীর ঘোষ অনন্য? ভারতে বস্তুবাদ চর্চার ইতিহাসে প্রবীর ঘোষ একমাত্র ব্যক্তি নন। অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ সাহু, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এরকমই কিছু উদাহরণ। কিন্তু এরা কেউই আমজনতার কাছে নিজের বক্তব্যকে নিয়ে যেতে পারেননি। উক্ত বুদ্ধিজীবীরা জনপ্রিয় ছিলেন শুধুমাত্র শিক্ষিত বিদগ্ধ মহলে। বস্তুবাদ চর্চা ছিল তাঁদের কাছে নিছকই একটা একাডেমিক চর্চার বিষয়। এরা কেউই বুজরুকদের সাথে সম্মুখ সমরে নামেননি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের বুজরুকি ফাঁস করেননি। চ্যালেঞ্জ জানাননি। গ্রামেগঞ্জে অনুষ্ঠান করে মানুষের কাছে বস্তুবাদী চেতনার বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করেননি। তাই একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে তাঁরা পরিচিতিও লাভ করতে পারেননি। আমজনতার মাঝে তাঁদের চিন্তাধারাকে ছড়াতে পারেননি বিন্দুমাত্র। অন্যদিকে প্রবীর ঘোষ শুধু অ্যাকাডেমিক কচকচানির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে রূপ দিয়েছিলেন আন্দোলনের। পৌঁছে দিয়েছিলেন প্রান্তিক মানুষের কাছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলার শহরে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। হাজার হাজার অনুষ্ঠানে হাতে কলমে ফাঁস করে দেখিয়েছেন বিভিন্ন অলৌকিক কৌশলের বুজরুকি। চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, জ্যোতিষীদের। ফাঁস করেছেন জ্যোতিষীদের অতীত বা ভবিষ্যৎ বলার রহস্য। চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের। এরজন্য একাধিকবার প্রাণঘাতী হামলাও হয়েছে তাঁর উপর। আর এসবই

প্রবীর ঘোষকে বানিয়েছে জীবন্ত কিংবদন্তী। বানিয়েছে সুপার হিরো। আজ সুকুমারী ভট্টাচার্য বা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম যত লোক জানে তার একশোগুন বেশী লোক জানে প্রবীর ঘোষের নাম। জানে যুক্তিবাদী সমিতির নাম। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'মানুষের নেতা', এভাবেই তিনি যুক্তিবাদ-কে পৌঁছে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মাঝে।



প্রবীর ঘোষ যখন যুক্তিবাদী আন্দোলন শুরু করেন তখন এদেশে তথা এ রাজ্যে বিজ্ঞান সংগঠন ছিল হাতে গোনা। টিমটিম করে চলতো সেসব সংগঠন। সাধারণ মানুষ নামও জানতো না তাদের বিশেষ। বিজ্ঞান আন্দোলনের জোয়ার তিনিই প্রথম আনেন এদেশে। একের পর এক জনপ্রিয় বই লিখে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে, জ্যোতিষী, বাবাজী মাতাজীদের বিভিন্ন বুজরুকি হাতে কলমে ফাঁস করে, রেডিও টিভিতে বিভিন্ন লাইভ অনুষ্ঠানে নামকরা জ্যোতিষীদের নাস্তানাবুদ করে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আর্টিকেল লিখে এমনই এক হাইপ তিনি তৈরি করেন যে প্রায় রাতারাতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন। গড়ে ওঠে কুসং-স্কারবিরোধী আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। প্রবীর ঘোষ ও যুক্তিবাদী সমিতি আসরে নামার আগে এ রাজ্য তথা এ দেশের আনাচে কানাচে খোঁজ মিলত নানা 'অলৌকিক' ক্ষমতার অধিকারী বাবাজী মাতাজীদের। রমরম করে চলত তাদের লোক ঠকানোর ব্যবসা। কিন্তু আজ মাথা খুঁড়লেও অলৌকিক ক্ষম-তার অধিকারী বাবাজী মাতাজীর দেখা পাওয়া ভার। এই কৃ-

তিত্বের সিংহভাগই যে প্রবীরবাবুর অবদান এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এছাড়াও, যে সময় অধিকাংশ বিজ্ঞান সংগঠন সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বলতে ভয় পেত, যারা তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছিল কৃষিতে জৈব সার ব্যবহার, খাবারে ভেজাল ধরার পদ্ধতি ইত্যাদি নিরীহ বিষয়ে, যাতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে না হয়, সেই সময় অসীম সাহসে ভর করে তিনি সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর লেখা বইয়ে ধর্মকে ‘ক্যানসারের চেয়েও মারাত্মক, পরমানু বোমার চেয়েও বিপজ্জনক’ বলার হিম্মত রেখেছেন। আর এমন একটা সময়ে তিনি এই কাজ করেছেন যখন চারপাশের ১০০% মানুষই ছিল ধর্মবিশ্বাসী, ঈশ্বরবিশ্বাসী। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কতটা মেরুদন্ডের জোর, কতটা বুকের পাটা থাকলে তবে ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া দেশে দাঁড়িয়ে একথা বলা যায়।

শুধু কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনই নয়, তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কুসংস্কার টিকে থাকার পিছনে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকাকেও। দেখিয়েছেন কেন রাষ্ট্রশক্তি তোল্লাই দেয় কুসংস্কারকে, তোল্লাই দেয় ভাববাদী চিন্তাধারাকে। দেখিয়েছেন শোষিত মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখতে পারলে, দৈব বিশ্বাসী করে রাখতে পারলে কিভাবে অবাধে শোষন, লুণ্ঠন করা যায় তাদের। দেখিয়েছেন ভাববাদী চিন্তা কিভাবে প্রতিহত করে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা, ঘুম পাড়িয়ে রাখে মানুষের চেতনাকে। কোভুর বা জেমস র্যান্ডির মতো প্রখ্যাত যুক্তিবাদীরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও কুসংস্কার টিকে থাকার পিছনে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা নিয়ে ছিলেন নীরব। কুসংস্কারের জন্য তাঁরা দায়ী করেছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরই। দায়ী করেছিলেন তাদের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার অভাবকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা টিকে থাকার পিছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা, পুঁজির ভূমিকা নিয়ে তাঁদের এই নীরব থাকার কারণ হয় তাঁদের অজ্ঞতা, আর নয় রাষ্ট্রশক্তির কোপে পড়ার

আশঙ্কা। এদিক থেকেও প্রবীর ঘোষ ছিলেন ব্যতিক্রমী। শুধু ভাববাদের বিরুদ্ধে নয়, তিনি মুখ খুলেছিলেন হুজুর-মজুর শ্রেণীকাঠামোর বিরুদ্ধে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে। স্বপ্ন দেখি-য়েছিলেন সাম্যবাদের। তিনি দেখিয়েছেন শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব শোষণমুক্তি ঘটাতে পারে না, পাশাপাশি চালাতে হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। যাতে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী সমাজের কু-আচার, কু-প্রথা থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারে। এখানেও তিনি অনন্য।

বিতর্ক যে তাঁকে নিয়ে হয়নি তা নয়। বস্তুত বিতর্ক ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিছু বিতর্ক বা সমালোচনা যেমন ছিল যৌক্তিক, তেমনই ছিল কুৎসার, অপপ্রচারের বন্যা। কুৎসাকারীরা তাঁকে টেনে নামাবার, মিথ্যা অভিযোগে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টার কসুর কোনওদিনই করেনি। এরমধ্যে জ্যোতিষী, বাবাজী মাতাজীরা যেমন আছে তেমনি আছেন যুক্তিবাদী নামধারী কিছু কুলাঙ্গারও। কারণ তাঁরা জানতেন প্রবীর ঘোষ একজন ব্যক্তিমাত্র নয়, একটা আদর্শ, একটা যুগ, একটা সংগ্রামের নাম। তাই প্রবীর ঘোষকে ‘খলনায়ক’ প্রমান করতে পারলে কুঠারাঘাত করা যাবে যুক্তিবাদী চেতনার মূলে। সেই ১৯৯৬ সাল থেকে একটি গোষ্ঠী দাবী করে আসছে তিনি নাকি যু-ক্তিবাদী সমিতি থেকে ‘বিতাড়িত’। দাবী করে আসছে তিনি নাকি শ্লীলতাহানি, অর্থ তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত। ভুয়ো ডিগ্রীর অধিকারী। স্ত্রীর উপর তিনি নাকি ‘নির্মম অত্যা-চার’ করেন। এই সমস্ত অভিযোগে আদালতে একের পর এক মামলাও এনেছে তারা। একটা দুটো নয়, একের পর এক তেরোটি মামলা। কিন্তু ‘পরাজয়’ শব্দটি প্রবীর ঘোষের অভিধানে ছিল না কোনওদিনই। আদালতের লড়াইতেও জয়ী হয়েছেন তিনি। যে কটা মামলার রায় বেরিয়েছে তার প্রতিটিতেই মহামান্য আদালত তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন সমস্ত অভিযোগ থেকে। আদালতের লড়াইতে পরাস্ত হয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসা রটনাকেই মূল হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে কুৎসাকারীরা। এটাই তাদের শেষ সম্বল।

প্রবীর ঘোষ আজ আর নেই৷ কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর অজস্র অনুরাগীর মধ্যে৷ বেঁচে থাকবেন যুক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে৷ যতদিন ভাববাদ বিরোধী লড়াই চলবে, যতদিন অলৌকিকতা বিরোধী লড়াই চলবে, ততদিনই প্রবীর ঘোষ ধ্রুবতারা হয়ে দিক নির্দেশ করবেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের। প্রবীর ঘোষরা মরেন না৷ মরে কেবল তাঁদের নশ্বর দেহটি।

লং লিভ প্রবীর ঘোষ।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

‘ধর্ম’ ক্যানসারের চেয়েও মারক, পারমানবিক বোমার চেয়েও ধ্বংসকারী। শোষকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করতে না পারলে চেতনা মুক্তির যুদ্ধ জয় অধরায় থেকে যাবে - এই পরম সত্য প্রতিটি চেতনা মুক্তির আন্দোলনকারীকে বুঝতেই হবে।”

-প্রবীর ঘোষ

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ: প্রবীর ঘোষ

লিখেছেন – রাজু দত্ত



কৈশোরে মিতালি পিসির সৌজন্যে তাঁর সাথে আমার আলাপ। মাধ্যম ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ গ্রন্থের প্রথম খন্ড। এরপর এই বইটির বাকি চারটি খন্ড ও ‘আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ বইগুলি পড়ে ফেলি। বয়সজনিত মানসিক সক্ষমতা দিয়ে এই বইগুলির মর্মবস্তু সাধ্যমতো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। এই বইগুলি আমার কিশোরমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য ও ইতিহাস পছন্দের বিষয় ছিল এতদিন, এরপর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মালো। আমার মানসিকতার ক্রম পরিবর্তন ঘটতে লাগলো।

এ কথা সত্য যে কোনও এক বা একাধিক বই পড়ে রাতারাতি নিজেকে বদলানো যায় না, তবে বইটির বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে, তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার যথার্থতা অর্জন করা যায়। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিজেকে মানসিকভাবে বদলাতে আমার সময় লেগেছে অনেকটাই। তবে বইগুলি আমার কিশোর মনে জাগ্রত অজস্র প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল। এ কথা আমি অস্বীকার করি না।

অন্যতম প্রিয় লেখক প্রবীর ঘোষ, যিনি আমার চেতনায় বি-জ্ঞানমনস্কতার বীজ বপণ করেছিলেন, তাঁর সাথে আমার মাত্র দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথমবার তাঁর অসুস্থতার সময়, শেষবার তাঁর মৃত্যুর সময়। এ বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা চলাকালীন গত 5ই ফেব্রুয়ারি সকালে আমি ও অরি-ন্দম তাঁর দমদমের বাসগৃহে তাঁকে দেখতে যাই। গতকাল 7 ই এপ্রিল, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে, দুপুরে অরিন্দমের সাথেই যাই তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে। উভয় সাক্ষাৎ বড়ো যন্ত্রণার। প্রথমবার গিয়ে দেখলাম, তিনি রোগশয্যায়, শেষবার মৃত্যুশ-য্যায়। জ্যোতিষীসহ সকল অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের ত্রাস, সমকালীন সময়ে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ লড়াকু প্রবীর ঘোষকে এভাবে দেখবো, কখনও ভাবিনি। কথাবার্তাও বিশেষ বলতে পারিনি। তাই একটা অস্ফুট আফসোস রয়েই গেলো।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায়, "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে"। মৃত্যু জীবনের শেষে এক সুনিশ্চিত ঘটনা। কেবল জীবের নয়, মহাবিশ্বের সকল গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রের মৃত্যু আছে। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের চক্র মহাবিশ্বে নিরন্তর আব-র্তিত। আমরা কেউই তার উর্ধ্বে নই। আমাদের বেঁচে থাকা আমাদের 'কাজ' এর মধ্যে। আমাদের বেঁচে থাকা মৃত্যুর পর আমাদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে পারার অন্তত একজন মানুষ রেখে যাওয়ার মধ্যে। আমাদের বেঁচে থাকা আমাদের গৃহীত আদর্শের মধ্যে। মৃত্যুর পরেও প্রবীর ঘোষ এভাবেই বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে।

পাঁচটি খন্ডে প্রকাশিত 'অলৌকিক নয় লৌকিক' ছাড়াও তিনি আরও যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলি হলো, যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, সংস্কৃতি: সংঘর্ষ ও নির্মাণ, অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি, যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তি, অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি,

পিনাকী ও অলৌকিক বাবা রহস্য সমগ্র, জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক, মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ মেডিটেশন, প্রেম, বিবাহ ও অন্যান্য, সম্মোহনের A to Z, গোল টেবিলে সাফ জবাব, রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু, মেমারিম্যান থেকে মোবাইল বাবা,প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং, যৌবনের বজ্রনির্ঘোষ, আমার ছেলেবেলা, স্বাধীনতার পরে, ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা, প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার-প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার, গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি, ধর্ম, সেবা - সম্মোহন, পিংকি ও অলৌকিক বাবা, অপরাধ বিজ্ঞান, স্বয়ম্ভর গ্রাম, বারে বারে ঘুরে ফিরে তুমি, যুক্তিবাদের চোখে গীতা, রামায়ন মহাভারত ইত্যাদি, কাশ্মীরে আজাদির লড়াই- একটি ঐতিহাসিক দলিল, অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস, সেরা যুক্তিবাদী সংকলন, দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম, আজকের যুক্তিবাদ কি ও কেন,- জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান, ভগবানে ভর ভূতে ভর, জ্যোতিষ একটি অবিজ্ঞান, যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম, ভূতে ভর এবং যুক্তিবাদীদের কথা।

সমকালীন সময়ে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ, জ্যোতিষী সহ সকল অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের ত্রাস, প্রবীর ঘোষ বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজের মধ্যে। তাঁর পথ অনুসরণ করে আগামী দিনে এগিয়ে যাবে যুক্তিবাদী আন্দোলন। প্রবীর ঘোষ ‘আলোর পথযাত্রী’ দের আলোর দিশারী হয়ে থেকে যাবেন আগামীদিনে।

সূচিপত্র

প্রবীরদার ভালো-মন্দ

লিখেছেন – মধুসূদন মাহাত



'প্রসঙ্গ প্রবীর ঘোষ' বইতে প্রবীর ঘোষ সম্পর্কে লিখেছি। এরপর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে লিখছি।

বাল্য এবং কৈশোর কালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও ডারউইনের জীবন দর্শন আমাকে কিছুটা বিজ্ঞানমনস্ক করেছিল। স্বপ্ন দেখতাম রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত মানুষ হওয়ার। প্রবীরদার বই সেই বৃত্তটাকে অনেকটাই সম্পূর্ণ করে দিল। একাদশ শ্রেনীতে পাঠের সময় পুরুলিয়া বইমেলা ঘুরতে ঘুরতে প্রবীর ঘোষের "অলৌকিক নয় লৌকিক" দ্বিতীয় খণ্ড বইটি প্রথম হাতে এল। পড়া শেষ করলাম কয়েক দিনের মধ্যেই। বইটি পড়ার সমস্ত অলৌকিক বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। পুজোপাঠ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিলাম। যেকোন অলৌকিকতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এরপর তাঁর টানেই বারবার কলকাতা যাওয়া, স্টাডি ক্লাসেও যাওয়া। বই পড়েই চিঠি লিখে শাখা গঠনের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠানো। নিয়মিত ল্যান্ডফোনে যোগাযোগ করে বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কোলে ব্যারাক স্টাডি সেন্টারে। সেদিনের স্টাডি ক্লাসে হাজির ছিলেন সুমিত্রাদি, অরুনদা, বিপাশাদি প্রমুখ। তাঁর

বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই দেখা করতে আসতেন, স্টাডি ক্লাসেও অংশগ্রহণ করতেন। অলৌকিকতার বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ ও তাঁর কালজয়ী বেস্টসেলার বইগুলি তাকে অনেকের কাছেই হি-ম্যান করে তুলেছিল। "আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না", "সংস্কৃতি: সংঘর্ষ ও নির্মাণ" বইগুলি যেকোন পাঠকের মনে দাগ কেটে দেয়। প্রবীরদা বহু গডম্যানদের ভাণ্ডাফোঁড় করেছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং নিখুঁত কৌশল অবলম্বন করে। তাঁর পথ অনুসরণ করে আমিও কিছু অলৌকিক ঘটনার ভাণ্ডাফোঁড় করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা বন্ধ থেকে, বাল্যবিবাহ, ডাইনি সন্দেহে অত্যাচার, ধর্মের নামে বলি কুরবানি, চোখ বেঁধে পড়া, বালি পাচার থেকে ডি জে সাউণ্ড বন্ধ প্রভৃতির বেশিরভাগ ঘটনায় ছিল প্রচণ্ড জীবনের ঝুঁকি। যেকোন রকম সাহায্যের জন্য প্রবীরদাকে ফোন করলেই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। মাঝে মধ্যেই প্রতিটি শাখার খবর ফোনে নিতেন। পণহীন বিয়ে করা থেকে অনেক ব্যক্তিগত সমস্যারও মুশকিল হাসান ছিলেন প্রবীরদা। স্টাডি ক্লাসে অনেককে বিভিন্ন ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পাঠও দিতেন তিনি। সিরিয়াস আলোচনার সময় ছাড়া, বাকি সময় হই হুল্লোড় করে থাকতে ভালো বাসতেন। তাঁর সঙ্গে পিকনিক করেও খুব মজা পেয়েছি। জ্যোতিষী সত্যানন্দ থেকে মোবাইল বাবার ভাণ্ডাফোঁড় আমার সময়ে উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল। অলৌকিক ঘটনার ভাণ্ডাফোঁড় থেকে সাম্যের সমাজ গঠনের রুপরেখা নিয়ে বই লেখা ও তার প্রয়োগ করার চেষ্টা তাকে জীবন্ত কিংবদন্তী করেছে। উনি আমার জীবনের সেরা " ফ্রেণ্ড, ফিলোজফার এণ্ড গাইড"।

তবে ত্রুটিহীন মানুষ পাওয়া আসলে সোনার পাথর বাটি। প্রবীদারও কিছু ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়েছে।

১) প্রবীরদা দাবি করতেন "আমরা যুক্তিবাদী" পত্রিকাতে উন্নত মানের লেখা না হলে প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু, আমি দেখেছি, সাংবাদিক লেখকদের লেখা নিম্নমানের হলেও তা

প্রকাশ পেত।

২) শেষ বয়সে তাকে দেখা শোনার জন্য এবং রান্নার জন্য পরিচারক/পরিচারিকা হিসেবে পরপর তিনজনকে নিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু , কাজ ছাড়ার পর তাদের নামে অপবাদ শুনেছি। এটা তাঁর বয়স্কজনিত মানসিক সমস্যাও হতে পারে।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"যে কোন চরিত্র বিশ্লেষণের আগে আমরা একটা কথা মাথায় রাখবো - আমরা কেউ-ই শ্রেণীবদ্ধতা ও কালবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নই। সমস্ত দোষ-মুক্ত মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। প্রতিটি চরিত্রকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন তাঁদের দোষের পাল্লা ভারী, না গুণের?"

-প্রবীর ঘোষ

সূচিপত্র

একটা কাঠ ও আমি: কথোপকথন ১

লিখেছেন – অমিত দাস



আমি: আচ্ছা, এই যে কাঠের টুকরো, আপনি মাটিতে পড়ে আছেন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। মতামত চাই।

কাঠের টুকরো: (No response)

আমি: তাহলে কথোপকথন এগোবে না? আপনি কি অনিচ্ছুক?

কাঠ: (no response)

আমি: ৬-৭ বছর আগের কথা। আমার কিছু কিছু বন্ধু, যখন আমরা একসঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানে পড়তাম, জিজ্ঞেস করত—'তুই হস্তমৈথুন জানিস না। ওই শোন অমিত এখনও বাচ্চা আছে, ও ঐ জিনিসটা কী জিনিস জানে না।'' আমি কেন জানতাম না তার কারণ হয়তো দীর্ঘকাল সেই সব দৃশ্য মানসিকতা থেকে আমি সম্পূর্ণ নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলাম। কারণ আমার বন্ধু বৃত্তে আমি একাই ছিলাম, কলেজে ক্লাসের রীতি না থাকায় নিজের গ্রাম্য ও অশিক্ষিত অপরিণত মানসিকতা কখনও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যোগ হওয়ার সুযোগ পায়নি। নিজের মনে নিজেকে প্রদক্ষিণ করতাম। সেই দুটো জ্যামিতিক চৌম্বক ক্ষেত্রের তৈরি বায়বীয় ফ্যান্টাসিগুলো তখন নিজের নিয়মেই ঝরে যেত। যাইহোক এখন আমি সেটা জানি। আরও বিবাহিত বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে, নানা তথ্যসূত্র দেখে জেনেছি, স্বাভাবিক নারী-পুরুষ একটা বিশেষ সময়ে

মিলিত হলে, পরবর্তীকালে সন্তানের কামনা বা আগমন বাস্তবায়িত হয়।

তার থেকেও বড় ব্যাপার, গর্ভে সন্তান এলে ধারণকারী তা টের পান ও সেই বিকশিত হতে থাকা মানবপ্রাণের উপস্থিতি ধীরে ধীরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে সবাই বুঝতে পারেন। তার মানে ১) কেউ আসবেন সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বপরিকল্পিত, কারণ কী করলে কী হয় সেটা সম্ভবত প্রায় মধ্যযুগের আগে থেকে মানুষ জানে। ২) যখন সবাই বুঝতেই পারেন যে কেউ আসছেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে সেই আশা সম্ভাবনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অনুসারে আইনত কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আটকাতে পারেন তখন নিশ্চয়ই সেই মানবপ্রাণের আগমনের আসা না আসা আপনার হাতে।

কাঠ: (no response)

আমি: যদি সেক্স করার ইচ্ছে ও পদ্ধতি নরনারীর হাতে থাকে, তাহলে যারা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়নি কিংবা অপরিণত ভাবে মৃত্যু ঘটেছে আগেই (ধরলাম কথা শেখার আগেই), তারা কি কখনও সর্বশক্তিমান/XYZ/স্রষ্টা ইত্যাদি হাবিজাবির কল্পনা করে যুক্তি, অ-যুক্তি কুযুক্তির ইমারত তৈরি করছেন? কাঠবাবু আপনি কী বলেন?

আচ্ছা যার প্রাণ নেই, যে আদৌ পৃথিবীতে আসেনি, কিংবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে করা সেক্স ছাড়াই ভূমিষ্ঠ এমন কোনও মানব শিশু আছে কি যে আমার এই লেখা পড়ে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কিছু লিখতে বা সাড়া দিতে পারে? থাকলে একটু জানাবেন প্লিজ। ও, আর কাঠবাবু আপনার কাছে স্রষ্টা/সর্বশক্তিমান/XYZ এসবের ব্যাখ্যা কী? কিংবা যদি কোনও কেউ থেকে থাকে একটু নামটা জানাবেন প্লিজ!

কাঠের টুকরো: (no response, যেমন মাটিতে পড়েছিল তেমনি আছে)

আমি: ধুর, সময় নষ্ট করলাম।

কাঠের টুকরো: (no response, যেমন মাটিতে পড়েছিল তেমনি আছে)

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“যদি ভগবানের কাছে ন্যায় মিলত, তাহলে দেশে বিচারালয় হতোনা। সরস্বতী যদি জ্ঞান দিতো, তাহলে বিদ্যালয় হতোনা। যদি প্রার্থনা করে রোগ সারতো, তাহলে হাসপাতাল হতোনা। কাজ না করে যদি ভাগ্য বদলাতো, তাহলে কার্যালয় হতোনা। মন্দির ধর্মের দালালদের নিজের দোকান। সেখানে যে যায় সে মানসিক ভাবে গোলাম হয়।”

- বি আর আম্বেদকর



গাছেদের কথা

লিখেছেন – রাজু দত্ত

সেই তেঁতুল গাছটার কথা মনে হলে আমি এখনও প্রিয়জন হারানোর শোক অনুভব করি। ছেলেবেলায় সেই গাছটা ছিল আমাদের একান্ত আপন।

গাছের নীচে সুশীতল ছায়ায় আমরা বেঁধেছিলাম একটা মাচা। এই মাচাটাই ছিল আমাদের ছেলেবেলার প্রখর গরমের দিনে একমাত্র আশ্রয়। আমরা সেই মাচায় বসে কত আড্ডা দিতাম। Rank card খেলতাম, গল্প গুজব করতাম। কখনও বা মাচায় শুয়ে ঘুমাতাম অঘোরে। স্কুল ছুটি থাকলে তেঁতুল গাছের নীচে বাঁধা এই মাচাতেই আমরা দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতাম।

গাছটা মারা গেলো। তাকে মেরে ফেলা হলো নির্মমভাবে। মালিকের আরও বাড়ি বানানোর প্রয়োজনে মেরে ফেলা হলো আমাদের প্রিয় তেঁতুল গাছটাকে। তেঁতুল গাছটার কত প্রতিবেশী ছিল। একে একে নিহত হলো অনেকেই। নিহত সেই গাছের স্থান দখল করলো ছোটো বড়ো রঙীন সুসজ্জিত বাড়ি

ও অট্টালিকারা। পাকা ও চওড়া হলো রাস্তাঘাট। তৈরি হলো কত অফিস, স্কুল কলেজ, সেতু, সুইমিং পুল,,,,,।

একসময় এ তল্লাট জুড়ে ছিল দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত। ক্ষেতজুড়ে মহানন্দে নৃত্য করত ধান আর মরশুমি সবজির গাছেরা। ছিল আরও কত গাছ। বট, বাবলা, ক্ষিরিশ, তাল, গাছেদের নামে এখানে কত পাড়ার নাম জানো।

তখন আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ ছিলনা। গ্রীষ্মের প্রখর দাব-দাহের দিনে, আমরা বসতাম গিয়ে গাছেদের কাছে। তারা প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতো হাসিমুখে। ডাকতো আমাদের। বলত, কৈ রে গরমে কষ্ট পাস বুঝি! আয় আয় একটু বোস দিকিনি আমাদের কাছে। আয়.....”।

জল পিপাসা পেত ওদেরও। ওরা ইশারায় বলত সে কথা। আমরা বালতি করে জল ভরে নিয়ে ভিজিয়ে দিতাম ওদের শিকড়। ওরা আনন্দে নেচে উঠতো। ডালপালা নেড়ে ওদের সে কি নাচ্। আমরা ওদের নাচ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

শুধু কি দিনের বেলা? রাতেও ছুটে যেতাম আমরা আমাদের গাছেদের সাথে দেখা করতে। ওদের পাশে বসে আমরা কত গল্প করতাম, গান গাইতাম, দুষ্টুমি করতাম। মাঝেমাঝে আরামে ঘুমিয়ে পড়তাম। বাড়ির বড়োরা এসে ডেকে নিয়ে যেতো। কেউ বলত “হ্যাঁ রে তোদের ঘরবাড়ি নেই? গাছতলায় শুয়ে আছিস!” আমরা হাসতাম।

আমরা ঢিল ছুঁড়ে যখন গাছেদের ডাল থেকে ফল পেড়ে খেতাম, গাছেদের আঘাত লাগতো, ওরা কোনও প্রতিবাদ করত না। ওরা নীরবে সহ্য করত সে আঘাতের যন্ত্রণা। প্রতিবাদ করত মালিক। গাছেদের মালিক বকা দিত আমাদের। আমরা

ফল খেতাম খিদে মেটাতে। আর সেই মালিকেরা অট্টালিকা বানানোর জন্য, উন্নত শহর বানানোর জন্য কি নির্মমভাবে হত্যা করলো গাছগুলোকে। আমরা প্রতিবাদ করিনি।

গাছেরা যাবার সময় বলে যেতো, "তোরা তো আমাদের বন্ধু, আমাদের ওরা এভাবে মেরে ফেলছে, তোরা নীরবে দেখে গেলি! কিছু বললি না! বাধা দিলি না! আমরা বলতাম, "আমরা তো মালিক নই।" গাছেরা বলত, "বাহ্ রে স্বার্থপরের দল! আমাদের কাছে এসে যখন শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে থাকতিস, যখন আমাদের ডাল পালায় আঘাতের পর আঘাত করে ফল পেড়ে খেতিস, তখন তো আমি বলিনি, "যা যা আমি মালিককে ফল দেবো, ছায়া দেবো, তোরা দূর হ। বুঝবি যেদিন থাকবোনা, সেদিন বুঝবি তোরা।"

বলতে বলতেই তাদের ওপর নেমে আসতো তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত। যন্ত্রণায় অস্ফুটে চিৎকার করত গাছগুলো। আমরা তখন উন্নত শহরের জন্ম দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। ঝা চকচকে একটা শহর। যেখানে থাকবে বিশাল বিশাল রঙীন অট্টালিকা, চওড়া রাস্তাঘাট, সেতু, সুইমিং পুল, দোকানপাট, অফিস, আদালত, স্কুল কলেজ,,,,,। হুস্ হুস করে সারাদিন ছুটে যাবে অজস্র গাড়ি। উফফ কি অসম্ভব সুখ পেতাম আমরা এটা ভেবেই। যেন স্বপ্ন মনে হতো। রঙীন স্বপ্ন!

আজ আমাদের গ্রামগুলি বদলে গেছে শহরে। আমাদের স্বপ্নের শহর। আমরা কত আধুনিক হয়েছি। এখনও গাছেরা আছে। তবে অধিকাংশ ফুলের গাছ। ফ্ল্যাটের জানালায়, বাড়ির ছাদে তাদের দেখা যায় এখন। বৃক্ষদের ভিড় তেমন আর চোখে পড়েনা আগের মতো। তাও সেইসব বৃক্ষরাজির কাছে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা সর্বত্র। কোথাও সেই নির্দেশ কোনও ব্যক্তির, কোথাও বা সরকারের। যে যেখানে মালিক আর কি!

কিন্তু কোথায় যেন একটা কষ্ট হচ্ছে। কিসের কষ্ট এটা? এ কি! আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে কেন! অক্সিজেন কি কমে গেলো নাকি পৃথিবীতে? এত গরম লাগছে কেন আমার? কি অসহ্য উষ্ণ বাতাস আমার চোখেমুখে অবিরাম আঘাত করে চলেছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কেন এমন হচ্ছে?

আমায় একটু ছায়া দাও, একটু শীতল বাতাস করো আমায়। কেউ শুনতে পাচ্ছো? কেউ নেই! সবাই গেলো কোথায়! কৈ কেউ শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো হ্যালো,,,,আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। এসি টা চালাও,,,,, অক্সিজেন সিলিন্ডারটা একটু,,,,, হ্যালো,,,,কেউ আছো.....হ্যালো....

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"আমাদের প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য দুটি সমস্যা রয়েছে - পারমাণবিক যুদ্ধ এবং - পরিবেশ বিপর্যয়।"

- নোয়াম চমস্কি

সূচিপত্র

অনুগল্প:

সংকল্প

লিখেছেন – জনা বন্দ্যোপাধ্যায়



আজ 'মানসী' আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। বাবা মা-র একমাত্র সন্তান হিসাবে পৈতৃক সূত্রে যেটুকু অর্থ পেয়েছেন, সবই সুতপা সেন রূপান্তরকামী মানুষজনের আশ্রয় 'মানসী' আশ্রমের জন্য দান করেন। বর্তমানে রূপান্তরকামীদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তারা সামাজিক জীবনের স্বীকৃতি পেয়ে নিজের নিজের জীবিকার পথও খুঁজে নিচ্ছে।

আজকের দিনটা বিভিন্ন রূপান্তরকামী মানুষজনের সঙ্গেই কাটে সুতপা সেনের। এনজিও করার সূত্রে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদের সকলকে নিজেদের সাধ্য মতো জীবকা নির্বাচনে উৎসাহ দেন ও স্থায়ী বাসস্থানের আশ্বাস দেন সুতপা। দিদি হিসাবে তাদের সকলের কাছে বেশ জনপ্রিয় তিনি। মানসিক দৃঢ়তা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগ না থাকলে 'মানসী' গড়ে উঠত না। এজন্য কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তা সুতপা পেয়েছেন।

"মানসী গড়ে তোলার কাজে আপনি কেন সংকল্প নেন?" স্থানীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সুতপা হেসে বলেন, " জীবন তো শুধু নিজের জন্য নয়। পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্যও ভাবা উচিত – এই সংকল্পেই এগিয়েছিলাম।"

সমবেত সকলে করতালি দিয়ে সাধুবাদ জানান তাঁকে।

সুতপা সেনের পঁচিশ বছর আগের স্মৃতির পাতাগুলো আজও অমলিন। সুতপার স্কুলের বান্ধবী মানসী হরমোনের পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরুষ হতে চেয়েছিল। কলেজে পড়তে সে দৃঢ় ভাবে সুতপাকে ভালোবাসার কথা বলেছিল। স্কুল থেকেই মানসী সুতপার সব থেকে কাছের বান্ধবী ছিল, যাকে সুতপা মনের কথা না বলে থাকতে পারতেন না। তাদের মান অভিমান খুনসুটি ধীরে ধীরে প্রেমের আকার নেয়। কলেজে পড়তে মানসীর বাইকে করে শহর ছাড়িয়ে সুতপা গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে দুটি মানুষ মানসিক ভাবে আরও কাছাকাছি হত। খালের ধারে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মানসীর কাঁধে মাথা রেখে সুতপা স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যেতেন।

মানসীর পুরুষসুলভ ভাবভঙ্গী ও পোশাক দেখে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছিলেন সুতপার বাবা মা। বি.এ পাশ করে এম.এ পড়তে চেয়েছিলেন সুতপা। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও বাড়ি থেকে তখন তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। গভীর দুঃখে মানসী সুতপার বিয়ের দিনই সুইসাইড করে-এই খবরটা বিয়ের কদিন পর সুতপা পান। মানসিক ভাবে ভীষণই ভেঙে পড়েছিলেন।

অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে পারেননি সুতপা। ছোট থেকে যে সংস্কার ও বিশ্বাসে মানুষ, তার কিছুই যেন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মিলত না। এমনকি তাঁর স্বামীও তাঁকে বোঝেননি। তাই দু বছরের মাথায় ডিভোর্স-এর সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেননি সুতপা। তারপর থেকেই তিনি বেছে নেন এনজিও-র কাজ। মানুষের উন্নয়নকে ব্রত করে এভাবেই শুরু হয় সুতপার দীর্ঘ পথ চলা।

সূচিপত্র

গল্প:

এক রসসাহিত্যিকের অলৌকিক নরকযাত্রা

লিখেছেন – অশোক কুমার দাস

চার্বাক চলে গেলেন। আমি ওনাকে তিক্তবাবু বলেই ডাকতাম। মাঝে মাঝে তেতোবাবু। আবার কেউ ডাকতেন ঝাঁজবাবু, কেউ ডাকতেন ঝালবাবু, কেউবা বাঁকাবিহারী, বঙ্কিমবাবু - এমনি সব, মানে শ্রীকৃষ্ণের মত তাঁর মধুমাখা অষ্টোত্তর শতনাম আরকি। টক-ঝাল কষা-নোনতা শতরসের ককটেলে সম্পৃক্ত সদাহাস্যময় সদাকৌতুকপ্রবন রস-সাহিত্যিক রসরাজ আমাদের অলরাউন্ডার চার্বাক মহারাজ। আমার রঙ্গব্যঙ্গ পত্রিকার সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় লেখক।

মৃত্যুপূর্বকালে সজ্ঞানে তাঁর নিজেরই ড্রাফ্ট করা তাঁর অকাল স্বর্গ /নরকপ্রাপ্তির ‘আনন্দময়’ শোকের বিজ্ঞাপনটি পড়ে সকালের চা’টা তেতো হয়ে গেল। ‘চার্বাক’ কলম নামে তাঁর লেখা রম্যরচনা ও স্যাটায়ারগুলি কটুস্বাদের হলেও বেশ পাঠকপ্রিয় ছিল। আধুনিক পাঠকেরা কটুতিক্তরসাদি পছন্দ করে ও যে সব নেতারা সভা সমিতিতে অসভ্য খিস্তি খেউড় করে তাদের বীরের সম্মান দিয়ে ভোট দেয় বলে ওনার বিশ্বাস ছিল। এজন্য নাকি আধুনিক এসেম্বলি পার্লামেন্টে অসৎ অশি-ক্ষিত অসভ্য নেতারই প্রাবল্য।

পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তেই থাকুন না কেন, মনে কোন নতুন রসের উদয় হলেই ই-মেল করতেন তাঁর নিজস্ব ঘরানার রসসাহিত্য। উনি যোগ দেবার পর আমার পত্রিকার কাটতি দুগুনের বেশী হয়ে গেছিল। তবে তাঁর উগ্র নাস্তিকতা বড্ড উৎকটভাবে প্রকট হতো তাঁর রঙ্গব্যাঙ্গে। সেগুলো ধর্ম-

ভীরু দুর্বল পাঠকদের ধর্মাভ্যাসের আবেগে আঘাত করত প্রবলভাবে। বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাবে "ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়া একজন মানবপ্রেমী সমাজসেবী সাধুপুরু-ষের সামাজিক কর্তব্য" বলে উটকো উল্টাপাল্টা বাজে তক্ক শুরু করে দিতেন। এ মহান কর্তব্য না করলে নাকি মানুষের মধ্যে কৌতূহল জন্মায় না, মানুষ প্রশ্ন করতে শেখে না। তারা কেবল বাপ ঠাকুরদাদের তামাদী হওয়া অভ্যাস বিনা প্রশ্নে তামিল করেন মাত্র।" বলতেন, "বুদ্ধ, যীশু, সক্রেটিস, মহ-ম্মদ, নিমাই, রামমোহন, বিদ্যাসাগররা যদি তাঁদের সমসাময়িক যুগের আধমরা ভীতু মানুষদের আবেগ অভ্যাসে আঘাত না দিতেন, তাহলে এখনও সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেত, সতী পুড়তো, বাল্যবিধবারা কাশীর রঙিন পল্লীতে নাচতে নাচতে পচতো, গরুর দুধে সোনা ফলত, পাথরের গণেশ ঢক-ঢক করে দুধ খেত, ঈশপের গল্পের শুক সারিরা কৃষ্ণ-নাম গাইত, পাপীরা তাদের দেহ মন থেকে পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য সাগরজলে ডুব দিতো, নিচুজাত বিদ্বেষী বেলুড় মঠে নাকি শুধু ব্রাহ্মণকন্যাই কুমারীপূজার জন্য মনোনীত হতো ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বলতেন, "এখনও হয়ত আমরা আমাদের আদি গুরুজনদের অনুসরণ অনুকরণ করে উলঙ্গ থাকতাম অন্যান্য জীবজন্তুভাইদের মত। বলতেন, "ধর্মীয় আবেগে আঘাতের বিরুদ্ধে যে অসাংবিধানিক আইন আছে সেটি বাতিল করা উচিত।"এই ছিল তাঁর ফিলোজফি, এমনি তাঁর বাঁকা বাঁকা আজব আজব বোকা বোকা কথা। লেখার ভাষাটাও ছিল গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। রাস্তাঘাটের নাটুকে নেতা-মন্ত্রী, লুম্পেন-মাস্তানদের বক্তৃতার মতো খিস্তি খেউড়ে ভরা। তবে মাঠভরা শিস মারা হাততালি দেওয়া ভাড়াটে শ্রোতা ও গ্রাম্য ভোটারদের মত, কিংবা বোকাবাক্সের টিভি সিরিয়াল বা ঝগড়াঝাটির দর্শক শ্রোতাদের মত আমার পাঠকেরাও সে অশ্লীলতা অসভ্যতা খেত ভালো। আর ওনাদের বিপুল ভোটে আমার পত্রিকা জিতে গিয়ে কাটতি বাড়াতো। এমনি চরিত্র ছিল চার্বাকের। তবে যে গরু দুধ দেয়, আর যে লেখক পাঠ-কসংখ্যা বাড়ায় তাদের খুরের লাথি একটু আধটু সহ্য করতে

হয়। তাই তাঁর সব কুযুক্তি আমি মুখ বুজে সহ্য করতাম।

যাক, উনি এখন গত হয়েছেন, মৃত মানুষের নামে নিন্দামন্দ করা পাপ, তাই ওনার চরিত্র সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়।

বিজ্ঞাপনে জানা গেল একাধিক দেশে রেজিষ্ট্রিকৃত তাঁর অন্তিম উইল অনুযায়ী কিডনি, লিভার চোখ ইত্যাদিসহ সমস্ত পুনর্ব্যবহার ও প্রতিস্থাপনযোগ্য কলাগুলি তাঁর মৃতদেহ থেকে কেটে বার করে নেবার পর তাঁর দেহটি আজ বিকাল চারটায় হাসপাতাল থেকে তাঁর মেট্রোপলিটনের ‘কস্মোপ-লিটন হাউসে’ নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে মাত্র দু-এক ঘন্টার জন্য শায়িত থাকবে যাতে করে তাঁর গুনগ্রাহী ও পরিচিতজ-নেরা তাঁর অবশিষ্ট মরদেহটিকে শেষ দেখা দেখতে পারেন। নানা দেশমহাদেশের নাগরিক ও অধিবাসী তাঁর ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী আত্মীয় পরিজনদের জন্য অপেক্ষা না করে তাঁর কলামুক্ত সে দেহটিকে নিয়ে যাওয়া হবে মেডিকেল কলেজে। সেখানে ছাত্র ছাত্রীরা দেহটা চিরে চিরে হাতেকলমে এনাটমি ফিজিওলজি শিখবে। শেষ পর্যায়ে তাঁর অবশিষ্ট দেহাংশটা পচামাংসভুক পশুপ্রাণীদের বিলিয়ে দেওয়া হবে খন্ড খন্ড করে। এটাই তাঁর অশাস্ত্রীয় অন্তিম বাসনা। হাতে উল্কি করে এই মর্মে বিজ্ঞাপনও করা আছে যাতে মরণান্তে তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা তাঁর ইচ্ছাপূরণে কোনও আইনী বাগড়া না দিতে পারে।

আমার পত্রিকার সামনের মাসের সংখ্যাটার ছাপা শেষ। শুধু মলাট আর স্টিচিংটাই বাকি। বেশ গুছিয়ে একটা মর্মস্পর্-শী শোকবার্তা ড্রাফট করে তেতোবাবুর একটা ছবিসহ মেল করে দিলাম প্রেসে। বলে দিলাম ফাঁকা তৃতীয় মলাটপাতায় ওটা ছাপাতে, আর পাঁচশ কপি এক্সট্রা ছাপাতে। শ্রাদ্ধের আন-ন্দভোজে, অভাবে স্মরণসভার জমায়েতে বিক্রি হয়ে যাবে ওগুলো। পেটভরা পেটুকরা ঢেকুর দিতে দিতে পান মুখশুদ্ধি চেবাতে চেবাতে আমাদের পত্রিকার কপি কিনতে বাধ্য হবে চক্ষুলজ্জার খাতিরে।

এরপর বন্ধুবান্ধবদের শেয়ার করার অনুরোধ জানিয়ে শোকবার্তাটা পোস্ট করে দিলাম ফেসবুকে। এক ঘন্টার মধ্যে চুয়াল্লিশটা লাইক, বাইশটা অশ্রু গড়ানো মুখ ভ্যাটকানো ইমোজি, তিরিশটি মন্তব্য আর একুশটা শেয়ার! ভাগ্য একটা করেছিলেন বটে! অকালে হলেও তাঁর মরণ স্বার্থক। স্বার্থক তাঁর চির আকাঙ্খিত আদর্শ মরণ। ঈশ্বরকে সত্বর কাছে পাওয়ার মহানন্দ। কোন একজন ঈশ্বরের কাছে তাঁর অশান্ত আত্মার শান্তি কামনা করে নিয়মমাফিক বিজ্ঞাপনও দিতে হবেনা পয়সা খরচ করে।

সৌজন্য রক্ষার খাতিরে সমবেদনা জানানোর জন্য চার্বাকগিন্নীকে ফোন করলাম। ধরলেন না। সারা জীবন যতই ঝগড়াঝাটি ফাটাফাটি চুলোচুলি করুননা কেন, স্বামীহারা হয়ে খুব সম্ভব শোকে কিংবা হয়ত হঠাৎ স্বাধীন হবার আনন্দে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন ভদ্রমহিলা। এ সময়ে ওনাকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আমি যে ভদ্রতা করে ফোন করেছিলাম সেটা মিসডকল লিস্ট থেকেই জেনে যাবেন। সেটাই যথেষ্ট। জানতে পারবেন আমি তাঁকে কতোই না ভালোবাসতাম। এই মওকায় লেখকের বাকি মানুস্ক্রিপ্টগুলো বিনা রয়ালটি দিয়ে হাতিয়ে নেব ওনার কাছ থেকে।

চার্বাকভবনে যাবার পথে লেক মার্কেট থেকে একটা মড়া সাজানো সাদা ফুলের টায়ার ডিজাইনের তোড়া কিনে নিলাম শববাহী গাড়ির গায়ে ঝুলিয়ে দেবার জন্য। তা না হলে আবার কথা উঠবে সমাজের বাজারে। সে বাজারে টিকে থাকার জন্য নেতা, মন্ত্রী, জ্যোতিষ, সেলসম্যান, গুরুবাবা, পত্রিকা সম্পাদকদের কত রকমের নাটক যে করতে হয়! একটা সুদৃশ্য কার্ডে আমাদের পত্রিকার নাম ফুলের তোড়ায় সাঁটিয়ে দেব সেলোটেপ দিয়ে। সামান্য খরচে ভালো একটা বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে ফাঁকতালে।

বাইপাসের মোড় থেকেই ভিড় শুরু। সবাই

সাদা ফুলের তোড়া হাতে ছুটছে লেখকের কসমোপলিটান হাউসের দিকে। রাস্তার দু পাশের কোথাও পার্কিংয়ের জায়গা পেলামনা। দূরের একটা গলিতে কোনরকমে গাড়িটা পার্ক করিয়ে হাঁটতে থাকলাম মাথা নিচু করে, মুখ ভারভার ভাব দেখিয়ে। রাস্তার দু পাশে হাঁটতে থাকা পথিকদের বেশির ভাগের হাতে সাদা ফুলের তোড়া। তিনি যে এতো জনপ্রিয় ছিলেন তা জানতাম না আগে। হয়ত সাহিত্যিক নিজেও জানতেন না। জীবিতাবস্থায় এসব দেখে যেতে পারলে তাঁর আত্মা এই পৃথিবীতেই সজ্ঞানে সশরীরে শান্ত হতো। আত্মার শান্তির জন্য মরার পর আত্মীয়দের দেওয়া বিজ্ঞাপনের জন্য অথবা ঘটা করে শ্রাদ্ধ শান্তির নাট্যাভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না।

সাহিত্যিকের বাড়ীর পেল্লাই লোহার গেটের পাল্লাদু-টোর একটা বন্ধ। অন্যটাকে সিকিউরিটি আগলিয়ে রেখেছে। সিলেক্টেড দর্শনার্থীকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। সামনের রাস্তায় সবাই ফুল হাতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। মাথা নিচু করে। এক পাশে 'স্বর্গরথ' নামাঙ্কিত একটা শববাহী গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত চার্বাকের দেহটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাড়ির ভেতরে। শববাহী যানটির পেছনে নিউজ চ্যা-নেলের দুটি ভ্যান পার্ক করা আছে। ফটোগ্রাফাররা ঢাউস ঢাউস ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ছবি তুলছে রাস্তার জনসমাবেশের। ভাষ্যকারেরা মাইক হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লেখকের গু-ণগ্রাহীদের প্রতিক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করছেন। অনুমতি পেলে শবদেহের ছবি তুলতে ঘরের ভেতরে ঢুকবেন তাঁরা।

দোতলার হলঘরটায় একটা ডিভানে পাতা এম্বুলে-ন্সের স্ট্রেচারে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন চার্বাক। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। বুকে তাঁর ফুলের পাহাড়। মহিলা পুরুষ, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধায় ঘর ঠাসা। সবার মুখ গম্ভীর, চোখে কাঁদো কাঁদো অভিব্যক্তি। এতো ভীড়, কিন্তু প্রায় শব্দ-হীন ঘর। শান্ত গুরুগম্ভীর শোকস্তব্ধ পরিবেশে শুধু টিভির সাংবাদিকরা ধীরে ধীরে গলা উঠিয়ে নাবিয়ে, থেমে থেমে

ধরা ধরা কাঁপা কাঁপা গলায় সুর পাল্টাতে পাল্টাতে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন তাঁদের চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাদের শোনানোর জন্য।

তাঁদের প্রশ্নের জবাবে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে সামান্য একটু বাড়াবাড়ি করেই বললাম, "সঞ্জীববাবু ব্যাঙ্গ সাহিত্যের জগৎ থেকে অবসর নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার পর বঙ্গের ব্যঙ্গ সাহিত্য সাম্রাজ্যে এই চার্বাকই ছিলেন বর্তমান প্রজন্মের একছত্র অধিপতি। সেই নক্ষত্রপতনে বঙ্গীয় রসসাহিত্য জগৎ অনাথ হয়ে গেল। আর কিছু সত্যি মিথ্যে প্রশংসার কথা মনে মনে খসড়া করার সময় বিশ্বনিন্দুক জয়দেববাবু মুখ বাড়িয়ে দিলেন ক্যামেরার দিকে। তাঁর পত্রিকায় তিনি নিয়মিত মুখর হতেন চার্বাক নিন্দায়। কিন্তু আজ ঐ সাহিত্যিকের জনপ্রিয়তা দেখে সে পথে না গিয়ে ওনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "ওনার মত গুণবান লেখক দুর্লভ। এমন কি আমার চেয়েও ভালো লিখতেন তিনি....." ঘুরপথের অশ্লীল আত্মপ্রশংসা শুনে টিভির ভাষ্যকার মাইকটা ওনার মুখ থেকে সরিয়ে নিতে তিনি একটু ঘাবড়ে গিয়ে মাউথপিসটা ভাষ্যকারের হাত থেকে নিজের মুখের সামনে টেনে নিয়ে বললেন, "তাঁর কৌতুকগুলি বিতর্কিত, বিরক্তিকর ও অসহ্য হলেও অনেকের কাছে সুখপাঠ্য ছিল।" পাশ থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "ওনার কথা আর বলবেননা মশাই। উনি সদা সর্বদা রসেবসে বেয়াড়া রকমের টইটুম্বুর হয়ে থাকতেন। রঙরসের মাতাল। স্থান কাল পাত্র কোনও জ্ঞান থাকতোনা তাঁর কোনও রসের কথা মনে উদয় হলে। গুরুজন লঘুজন জ্ঞান নেই। পিকনিকেও যা আবার মন্ত্রীর গুরুগম্ভীর প্রশাসনিক বৈঠকেও তাই।রাস্তার সবজিওয়ালা, থেকে শুরু করে রাশভারী হেডমাস্টারমশাই, এমন কি হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিও রেহাই পেতেননা তাঁর হাসি মস্করার কামড় থেকে।"

আর একজনকে বলতে শুনলাম, "তবে বিপদেও পড়তেন তিনি তাঁর ঐ বদ স্বভাবের জন্য। হয়ত কোন ঝগড়াটে সবজিওয়ালীকে বলে বসলেন, – তোমার মুখের মত ঝাল দেখে

লঙ্কা দাওতো একশো। ব্যাস অমনি বাজারে লেগে গেল লংকাকান্ড। মহিলার মুখ তুলে কথা! বাজারের সব সবজিওয়ালা চেপে ধরলো ওনাকে। মার দিতে বাকি রাখল শুধু।"

-আরে সবজিওয়ালী ফলওয়ালা তো দূরের কথা নিজের শালী এমনকি নিজের গিন্নীর সাথেও মাঝে মাঝে বোকার মত মুখ ফস্কে রসিকতা করে ফেলতেন এই রসিক চূড়ামণি। কী দুঃস্বাহস! সন্তানসম্ভবা মেয়ের পেটের মধ্যেকার যমজ নাতি নাতনীর খেলাধুলার লাইভ ছবি সোনোগ্রাফিতে দেখার পর আনন্দে আটখানা হয়ে অফিস ফেরত কর্তার বেল শুনে তাঁর ঘরে ঢোকার আগেই রান্নাঘর থেকে চিৎকার করে বলে উঠলেন "সুখবর, সুখবর, ডাবল সুখবর......" পরবর্তী বাক্যের অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি চটজলদি বলে উঠলেন, "কেন, তোমারও নাকি?" ব্যাস, সাত ডিগ্রী স্কেলের ভুমিকম্প শুরু হয়ে গেল সংসারে। সাহিত্যিক তখন সক্রেটিস। ঘরে না ঢুকে সোজা বেরিয়ে গেলেন পাড়ার চায়ের দোকানের সন্ধানে"

এক মহিলা বলে উঠলেন, "ভদ্রলোক জীবিত থাকলে ওনার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে কি আপনাদের সাহস হতো?"

উত্তরে আর এক বৃদ্ধা মন্তব্য করলেন, "বলা যায় না, ওনার যা স্বভাব চরিত্তির ছিল, হয়ত দেখলেন আপনাদের এ সব কথা শুনে ওনার আকাশমুখী ডেডবডিটা স্থান কাল পাত্র ভুলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে রঙ্গব্যাঙে তুলোধুনো করে সব্বাইকে ঠান্ডা করে দিচ্ছেন।"

লেখকের লেখার ঘরের টেবিলটায় রাখা হয়েছে তাঁর একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। তাতে সবাই মালা পরিয়ে দিচ্চে। পাশে রাখা ধূপদানীতে ধুপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ছবিটা নাকি তাঁর এক নামকরা ফটোগ্রাফার বন্ধুকে দিয়ে তুলিয়ে নিজেই কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন তাঁর শেষযাত্রার জমায়েত বা শ্রাদ্ধের আনন্দভোজের অতিথিদের প্রদর্শনের জন্য।

পাশের ঘরের টেবিলে দুটো সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধানো

একটা খাতা। মৃতের গুণমুগ্ধরা লাইন করে দাঁড়িয়ে একের পর এক শোকবার্তা লিখছেন।

মৃতের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নানা জনের ভালো মন্দ নানান স্মৃতিচারণ ও মন্তব্য শুনছি। কিছু ফিসফিসিয়ে, কিছু সশব্দে।

– এত বড় লেখক হয়েও একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক।

– তবে উনি গোপনে গোপনে যে বেহেড মাতাল ছিলেন সেটা আমি নিজের চোখে দেখতাম রেসের মাঠে, আর বার-এ। উনি আমায় চিনতেই পারতেন না তখন নেশার ঘোরে।

– ফাঁক থেকে ওনার ধার করা আমার দশ হাজার টাকা চোট হয়ে গেল। এখনতো আর ওনার বিধবা স্ত্রীকে .....

– সেকি, আপনার মত ওয়ান পাইস ফাদার মাদার বন্ধক ছাড়া এতগুলো টাকা ....

– অত্যন্ত সজ্জন মানুষ ছিলেন। সুখেই বলুন কি দুখেই বলুন, সব সময় মুখে হাসি – মন রঙ্গরসে ভরপুর। ওঁর সাথে কথা বলে বড় সুখ ছিল। নিমেষে মনের দূঃখ ভুলিয়ে হাসিয়ে দিতেন। শত্রুদেরও বন্ধু করে নিতেন হাঁসতে হাঁসতে, হাসাতে হাসাতে।

– আমাদের সাথে তো ওনার একটা পারিবারিক সম্প-র্ক হয়ে গিয়েছিল। আমার গিন্নীতো চার্বাক প্রেমে পরকীয়া অজ্ঞান।

– আমার সাথে দেখা হলেই বিড়ি চেয়ে নিতেন আপন বড় ভাইয়ের মত।

– তবে উনি যে সঞ্জীব চাটুর্জেকে নকল করতেন সেটা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। ওনার লেখা রঙ্গরচ-নাই তার প্রমান। পোড়ে দেখবেন।

– তবে ওনার লেখাগুলো বাঁকা ভাষায় হলেও বেশ লাগতো পড়তে। মানে সুখপাঠ্য।

– থামুন মশাই, উনিতো সত্যজিৎ রায়কে নকল করে ডি-টেক্টিভ উপন্যাস লিখে বেশ ভালোই কামিয়েছেন।

– তাই নাকি ! ভেজালে ভেজালে দেশটা ভরে গেল দেখছি।

– অরে মশাই, ইনিতো সামান্য একজন লেখক। একটু আধটু এর ওর নকল করে, অপরের লেখা সামান্য অদল বদল করে লেখকেরা যে দুনম্বরী সাহিত্যব্যবসা করেন এটা কে না জানে। এতে দোষের কিছু নেই।

– ঠিক বলেছেন। স্কুলের মাস্টার থেকে শুরু করে, স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত সভাপতি থেকে শুরু করে, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে, উনিভার্সিটির উপাচার্য থেকে শুরু করে নানান দেশের প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কে যে একনম্বরী, আর কে যে চোরা পথে চাকরি বাগিয়েছেন, কে যে কাল্পনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্ট-রেট ডিগ্রী বা জ্যোতিষীর স্বর্ণপদক কিনেছেন তা বোঝা দায়। এখনতো আশপাশের সবাইকেই চোর পকেটমার মনে হয়। উঁচুস্তরের মাননীয় নেতানেত্রীদেরও কান্ডকারখানা দেখলে মনে হয় সর্বকালের সর্ববৃহৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ডাকাত দলের সর্দার।

– যা বলেছেন। বাসের গায়ে “পকেটমার হইতে সাবধান ---

–ছোটবেলায় আমি বিখ্যাত বহুল প্রচারিত একটা সাপ্তা-হিকে ‘যষ্ঠিমধু’ বিভাগের পাতার ওনার অনেক লেখা পড়ে ওনার ফ্যান হয়ে গেছিলাম। ঐ পত্রিকা ‘যষ্ঠিমধু’র পাতা বন্ধ করার পর...........

– এমন নক্ষত্রপতনের পর আর এমন লেখা লিখবে কে ? বাংলাদেশটা রসশুন্য হয়ে গেল।

– যা বলেছেন, হাসির ক্লাবের হাসিগুলো যেমন আমাদের কাঁদায়, তেমনি রম্য রচনার নামে এখনকার ভাঁড়ামির গল্প পড়েও হেঁচকি ওঠে।

বিভিন্ন দেশবিদেশের ভক্তদের নাম ঠিকানা লাগানো ফুলের তোড়া, ধুপ, মড়ার পোশাকে দেবার জন্য সুগন্ধি আসছে

কুরিয়ার এজেন্ট মারফত। চারদিকে অগুরু অগুরু মড়া মড়া গন্ধ। বিভিন্ন দেশবিদেশে থেকে তাঁর ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী আপনজনেদের পাঠানো ফুলমালায় আজকের নায়কের বুকে ফুলের পাহাড়। বড় নাতনী বিলেত থেকে অনলাইনে অর্ডার করে এক ক্রেট হুইস্কি পাঠিয়েছে ক্লান্ত শ্মশানবন্ধুদের বিনোদনের জন্য। স্মার্টফোনে আসা গাদা গাদা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছার মেসেজ দেখানো হচ্ছে ছাতে লাগনো বিগ স্ক্রিনে।

লেখকের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ভায়রাভাই উপস্থিত শোকগ্রস্থদের আপ্যায়ন করছেন চোখ মুছতে মুছতে। দিল্লিতে থাকা বর্তমান লেখকগিন্নী বিকেলের ফ্লাইট ধরে ফিরে আসছেন চিত্তরঞ্জন পার্কের আজকের কবি সম্মেলনে তাঁর স্বরচিত কবিতাপাঠ না করেই। কী মহান আত্মত্যাগ! লেখকের একাধিক প্রাক্তন প্রেমিকা আর আদিগিন্নীও এক কোনায় ছলোছলো নেত্রে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। একেই বলে বাঙালি রমণী। প্রেম কাকে বলে এরাই জানে। প্রেমভঙ্গ বা ডিভোর্স হবার পরেও প্রেম অটুট। অবশ্য গিন্নীদেবীর প্রাক্তন স্বামীরাও এসেছেন তাঁদের প্রাক্তন স্ত্রীকে সান্তনা দেবার জন্য।

বারান্দা দিয়ে দেখা গেল বিখ্যাত এক ফাস্টফুড কোম্পানীর ভ্যান এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনের রাস্তায়। তারপর একটা ভ্যান বিখ্যাত এক মিঠাই কোম্পানির। একটা আইসক্রিম কোম্পানির গাড়ীও। উপচে পড়া ভিড় ঠেলে ওদের কর্মচারীরা একে একে খাবারের প্যাকেট হুইস্কির বোতলগুলো নিয়ে সোজা তিন তোলার ছাতে উঠে গেল। সাথে সাথে বোতল রসিকরাও মৌমাছির মত উড়ে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

একটি ঘরে আত্মীয় স্বজনেরা শ্রাদ্ধের আমন্ত্রণপত্রের খসড়া তৈরি করছেন। ক্যাটারার নির্বাচন নিয়ে তর্কাতর্কিও চলছে। উপস্থিত আত্মীয়দের বাচ্ছাকাচ্চারা বড় বাড়ী পেয়ে লুকোচুরি খেলছে। একটা ঘরে আসন্ন শ্রাদ্ধভোজের মেনু তৈরি করছে কমবয়সী ছোকরারা। মৃদু ডেসিবেলে “আছে দুঃখ আছে মৃত্যু” বাজছে সাউন্ড সিস্টেমে। সর্বত্র একটা

শোক শোক, উৎসব উৎসব, আনন্দ আনন্দ, দুঃখ-দুঃখ, টক-ঝাল- মিষ্টির পরস্পর বিরোধী এক সাড়ে বত্রিশভাজা স্বাদের পরিবেশ।

অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ছাতে সাজানো হয়েছে নানা রকমের খাবার আলাদা আলাদা কাউন্টারে। চা,কফি, সফ্ট ড্রিঙ্কস, হার্ড ড্রিঙ্কস। ভাইরাভাইয়ের বিনীত অনুরোধে যে যার পছন্দমত খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছেন, পান করে ঢলাঢলি করছেন।

ব্যাপারটা কি ? এমন ভোজের কথা ভূ-ভারতে কখনও শুনিনি। কল্পনাও করিনি। একজন মানুষ মারা গিয়েছেন, বাড়িতে তাঁর বাসি মরদেহ শুয়ে আছেন চিরনিদ্রায়, এখনও পর্যন্ত তার সৎকার পর্যন্ত হয়নি - আর কিনা এত খাওয়া দাওয়া ফুর্তি ফারতা! আশ্চর্য! শ্রাদ্ধের দিনের জন্য কটাদিন অপেক্ষা না করেই এত আনন্দফুর্তির আয়োজন! ছি ছি ছি। শত ছি। মানুষ বড় হৃদয়হীন হয়ে উঠছে দিনদিন।

আমার ক্ষোভের উত্তরে চার্বাকভায়রা ভাই বিনয়ে বিগলিত হয়ে সাফাই দিলেন যে তিনি তাঁর প্রয়াত ভায়েরাদা-দার মৃত্যুপূর্ব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন মাত্র। তাঁর অতিথি দর্শনার্থীরা আনন্দভোজ ও চিয়ার্স মন্ত্র বলে আনন্দ-পান করে সন্তুষ্ট না হলে তাঁর দাদার আত্মা নাকি শান্তি পাবে না স্বর্গে কিংবা নরকে যেখানেই থাকেন না কেন!

এতবড় ঘোর উগ্রনাস্তিকও তাহলে মরার সময় নরকভয়ে কাতর হন! মরণকালে এমন ভীমরতির কারণেই পৃথিবীর দিকে দিকে আজও টিকে আছে হাজার হাজার ধর্ম, হাজার হাজার ভগবান। উঠছে চন্দ্র সূর্য সময়মত।

ভাইরাভাইয়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে আর একটা প্যাকেট তুলে নিলাম টেবিল থাকে। মটন বিরিয়ানিটা করেছে ভাল। চার্বাক আত্মাকে শান্ত করার দায়িত্ব না এড়িয়ে আর একবার একটা গ্লাসও ভোরে নিলাম বড় করে।

এমন সময় সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের জীপ এসে দাঁড়ালো বাড়ীর সামনে। ভাইরাভাইটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন অফিসারের দিকে। অফিসার বললেন যে তাঁর কাছে নাকি গোপন খবর আছে যে এটা সুইসাইড কেস, স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। মার্ডারও হতে পারে। ডেথ সার্টিফিকেট, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ইত্যাদি না দেখে মৃতদেহটিকে শ্মশানে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। একথা বলে মৃতের স্ত্রীকে ডাকতে আদেশ করলেন অফিসারটি।

ভায়েরাটি সবিনয়ে হাত জোড় করে বললেন, "আগে একটু মিষ্টিমুখ করে নিন স্যার। নইলে মৃতের পুন্যজীবনের অকল্যাণ হবে। আমি কথা দিচ্ছি আপনার নির্দেশ মেনে সব ডকুমেন্ট দেখিয়ে দেব ডেডবডি রিমুভ করার আগে।

-ঠিক আছে, ডেডদেহটাতো দেখান অন্তত চাদরটা তুলে।

- সেটাতে একটু অসুবিধা আছে। অঙ্গদানের কারণে দেহটা একটু বিকৃত হয়ে গেছে বলে তাঁর স্বামীঅন্ত-প্রাণ সদ্য বৈধব্যপ্রাপ্ত স্ত্রী অনুমান করছেন। উনি এয়ারপোর্ট থেকে এলেন বলে। তাঁর পৌঁছনোর আগে মৃতের আবরণ উন্মোচন করতে না করেছেন তাঁর শোকগ্রস্থ সহধর্মিনী। এটা স্যার একাধারে ধর্মীয়, অন্যদিকে প্রেমজ আবেগের ব্যাপার। জীবিত অবস্থায় বোমভোলা স্বামীকে পরিপাটি না সাজিয়ে বেরুতে দিতেন না তিনি। আজ তেমনি মৃত স্বামীটিকে না সাজিয়ে.........

– সব ঠিক আছে, কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট দেখাতে কি বাধা?

মহিষাসুরের পার্ট করা তাগড়াই ধৈর্যহারা ভায়রাটি তড়িঘড়ি স্ফীতোদর পুলিশ সাহেবটিকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন এক আত্মীয়ের হাত থেকে একটা মিষ্টির প্যাকেট, আর একটা খাম নিয়ে। খানিক বাদে মুখ মুছতে মুছতে খুব হাঃহাঃ করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন অফিসার। পুলিশ হলেও সদ্য মৃতের বাড়িতে এসে

তাঁর মৃতদেহের সামনে কি করে একটা মানুষের এত হাসি আসে বুঝতে পারলাম না। তবে বুঝতে পারলাম বেশ বড় অংকের একটা গোপন লেনদেন হয়ে গেল।

কিন্তু সুইসাইড! এমন সদাহাস্যময় সদানন্দ কৌতুকপ্রেমী সফল মানুষ সুইসাইড করেন কি করে! কিসের দুঃখ লুকিয়ে ছিল তাঁর হাসিমুখের অন্তরালে? বাহাত্তরেও এমন সতীসাধ্বী মা লক্ষী গিন্নী, সাত চড়ে রা নেই, এতো যার জনপ্রিয়তা, চার হাজার স্কোয়ার ফিটের বিলাসবহুল বাড়ী, মোটা টাকার সরকারী পেনশন, মোটা অংকের রয়্যালটি, দেশবিদেশে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আয়ের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী, নানা দেশের নানা ধর্মের নাতজামাই নাতবউদের নিয়ে ভরা সুখী সংসার – এ রকম লোকের বুকে কি এমন কান্না লুকিয়ে ছিল যে একেবারে সুইসাইড করতে হল? ধন্য মানবের মন, ধন্য ত্রিভুবন। বিচিত্র তাদের মনের প্রকৃতি তথা বিকৃতি! বার্ট্রান্ড রাসেল ঠিক কথাই বলেছেন।

মৃতের চারিদিকে ঘিরে অভিজাত ক্যাটারারের উপাদেয় প্লেট হাতে সবাই চার্বাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন কি চিরনিন্দুক সমালোচক, ব্যর্থ কবি সাহিত্যিকরাও চার্বাকের অপচিন্তা,অপকর্ম, অপদর্শন,অপকথন,অপসাহিত্যের কথা সৰাই ভুলে গেলেন। লাল জলের এমনি মহিমা। মুহূর্তে সবাই শোক দুঃখ ভুলে হাসি ঠাট্টায় মুখরিত।

অবিচুয়ারি লেখার জন্য টেবিলে রাখা দু'দুটো মোটা মোটা বাঁধানো খাতার সব পাতা শেষ। গদ্যে পদ্যে শোকসাহিত্যের উথাল পাথাল কান্না। নানা ঘরানার প্রতিভার উজ্জ্বল সমাবেশ।

চার্বাকের প্রিয় আলসেশিয়ানটা নীরবে শুয়ে আছে তার প্রভুর ডিভানের গায়ে গা ঠেকিয়ে। সারাদিন কিছু খায়নি। এতো আর বুদ্ধিমান চতুর হোমো স্যাপিয়েন নয়। অবলা এলেবেলে নির্বুদ্ধি পশুমাত্র। মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। হয়ত ভাবছে, এত মানুষ, কিন্তু গিন্নিমা নেই কেন? অনবরত বক বক করা মালিকই বা কেন নীরবে

গা ঢেকে শুয়ে আছে দিনভোর। মাঝে মাঝে সবার দিকে তাকাতে তাকাতে যেন বলছে প্রভুর গায়ের সাদা চাদরটা খুলে দিতে। সাহস পাচ্ছেনা। পরিচিত কেউ ঘরে ঢুকলে ছুটে গিয়ে তার পোশাক কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডিভানের দিকে। কী হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

চার্বাকপ্রিয়া গাড়ী থেকে নেবে আলুথালু বেশে লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে উঠে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সোজা উঠে এলেন ওপরে। সবাই হাতের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে হুড়মুড় করে তাঁর পাশে আসার কসরত করতে লাগলেন যাতে টিভির ক্যামেরায় তেনাদের মুখশ্রী ধরা পড়ে। ক্যামেরা লেখকপত্নীর ছবি তুলতে তুলতে যাচ্ছেন পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে। ধারাভাষ্যকার মাউথপিসটা হাতে ধরে পাশে পাশে এগুচ্ছেন –

"এখন কিন্তু আপনারা কিন্তু সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু। চার্বাকের মরদেহ কিন্তু শুয়ে আছেন ডিভানে। তাঁর সম্পূর্ণ দেহ কিন্তু সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার ওপরে ফুলের পাহাড়। আপনারা কিন্তু সদ্য স্বামীহারার উচ্চকণ্ঠের বিলাপ শুনছেন। কিন্তু উপস্থিত অনেকে তা সহ্য করতে না পেরে কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। লেখক যে কত জনপ্রিয় ছিলেন তা আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন। চার্বাকপত্নী লুটিয়ে পড়লেন স্বামীর পদতলে। গিন্নিমাকে দেখে কিন্তু সাহস পেয়ে অবলা পশুটি লাফিয়ে কিন্তু ডিভানে উঠে পড়লো কিন্তু ঘেউ ঘেউ করতে করতে। অনেক কিন্তু সয়েছে সে। আর কিন্তু অপেক্ষা করতে পারল না। ঢাকা দেওয়া সাদা চাদরটা কামড়ে টান মেরে কিন্তু ফেলে দিল মেঝেতে। আমি প্রকাশকে কিন্তু অনুরোধ করছি ক্যামেরাটা মৃতের মুখের দিকে ফোকাস, মানে কিন্তু ফো-কাস ....

ভাষ্যকার ছোকরাটি তোতলাতে তোতলাতে আচমকা থেমে গেলেন। ডেড সাইলেন্স। যাঁরা ডিভান ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা হঠাৎ করে পরিত্রাহি চিৎকার করে পিছিয়ে গেলেন ডিভানের পাশ থেকে। মনে হচ্ছে যেন বাঘ

বা ভুত ঢুকে পড়েছে ঘরে। চারিদিকে হুড়োহুড়ি। কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। পদপিষ্ট হবার ভয়ে সবাই দেয়ালের দিকে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছেন। বিমূঢ় ভাষ্য-কারের ফ্যাকাসে মুখে ভাষা নেই। ক্যামেরার হাত থর থর করে কাঁপছে। হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে ভাষ্যকার সাহস সঞ্চয় করে অনেক ‘কিন্তু’ সহযোগে আবার কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলেন, “আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, ... কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ..... মানে দেখতে পাচ্ছেন, মৃত চা-র্বাকের দেহ কিন্তু উঠে বসেছেন। আপনারা কিন্ত, মানে কিন্তু দেখছেন তাঁর চোখে সাঁটানো তুলসীপাতাটা উড়ে গেল পাখার হাওয়ায়। চোখ দুটো তাঁর পিট্ পিট্ করছে। মুখে কিন্তু তার সেই পরিচিত কৌতুকের হাসি। চার্বাকপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে হাসতে হাসতে তাঁর পিঠে কিন্তু ক্রমাগত মেরেই চলেছেন আদুরে ঘুঁষি, আর কৌতুকের কান্নার মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছেন, মরবে কেন, তাহলে আমার হাড় মাস খাবে কে? সাহিত্যিকের কুকুরটি তাঁর কোলে উঠে তাঁর গালটা চেটেই চলেছে, চেটেই চলেছে.......

যমালয়যাত্রার পথে মাঝরাস্তা থেকে সাহিত্যিকের ফিরে আসা দেখে সবাই এত আনন্দ পেয়েছে যে তাঁর ভায়-রাভাই উপস্থিত সবাইকে ডিনারেরও মৌখিক নেমন্তন্ন করার পর ক্যাটারারকে ফোন করতে লাগলেন নির্দেশমাফিক পুরো অর্ডার শিগগির ডেলিভারি দিতে।

টিভি ভাষ্যকারের অনুরোধে চার্বাক চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “ আসলে আমার নিজেকে সৎভাবে চেনার ইচ্ছে হয়েছিল। জীবিতাবস্থায় বুঝতে পারতাম না কে আমায় সত্যিকারের ভালোবাসে। সাদা কাপড়ের আড়াল থেকে এত মানুষের আগমন, মানুষের ভালোবাসা দেখে, সবার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার প্রশংসালোভী আত্মাটা আপাতত স্বর্গে উঠতে অস্বীকার করলো। যমরাজও তাঁর আদেশের টেম্পোরারি স্থগিতাদেশ দিলেন পুনর্বিবেচনা করে। বেয়াড়া আত্মাটার আরও কিছুদিন আনন্দময় পৃথিবীতে থাকার ইচ্ছা।

মাঝপথে আকাশ থেকে নেবে এসে সেটা আবার যীশু খ্রিস্ট হয়ে গেল এই বুকের মধ্যে।"

[শেষ অংশ শেষের পাতায়]

ওনার দিকে তাকিয়ে দেখি বুকের ওপরের ফুলের তোড়ার পাহাড় সরে গিয়ে সাদা পাঞ্জাবীর ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে "এপ্রিল ফুল"

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"ধর্মীয় আবেগে আঘাতের বিরুদ্ধে যে অসাংবিধানিক আইন আছে সেটি বাতিল করা উচিত।"

- সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

নাটক: চেন্নী

রচনা: অনুপ চক্রবর্তী



চরিত্র: প্রফেসর গুণ্ডাপ্পা, জাস্টিস কৃষ্ণান, কারিয়াপ্পা, চেন্নী, শবরী, গিরিশ, পুরোহিত।

(জাস্টিস কৃষ্ণানের ড্রইংরুম)

কৃষ্ণান: বলুন কী ব্যাপার, প্রফেসর গুণ্ডাপ্পা। আপনার টেলিফোনটা পেয়ে বেশ কৌতুহল হয়েছে আপনার সমাজনৃতত্ত্বের কাজের ব্যাপারে আমার মতামত আপনি চেয়েছেন দেখে। হ্যাঁ, কফি বলি?

গুণ্ডাপ্পা: না। থ্যাংকস। অন্য দিন তো দাবা খেলার ছলে আপনার চা-কফি ধ্বংস করি। কিন্তু আজ সেরকম মুডে নেই।

কৃষ্ণান: কী ব্যাপার?

গুণ্ডাপ্পা: ব্যাপারটা সমাজনৃতত্ত্বের হলেও, সমস্যাটা সম্পূর্ণ আমার নিজেকে নিয়ে। আমার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা। আর আমার এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে মতামত চাইতে এসেছি কিন্তু

একজন বিচারকের কাছে। জাস্টিস কৃষ্ণান, আপনি বিচারক। আপনার আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আপনি আপনার মতামত বলবেন। এটা আমার খুব প্রয়োজন।

কৃষ্ণান: ইন্টারেস্টিং! ব্যাপারটা কী?

গুণ্ডাপ্পা: বলছি, জাস্টিস কৃষ্ণান। তার আগে ইফ ইউ পারমিট, আমি একটা সিগারেট ধরাবো।

কৃষ্ণান: হাঃ হাঃ হাঃ হা। আজ কী ব্যাপার? স্মোক করতে আপনাকে নিষেধ করি স্বাস্থ্যের কারণে। বিচারকের দৃষ্টিতে নয়।

গুণ্ডাপ্পা: জানি। তবু আজ আপনি আমার কাছে শুধুই একজন বিচারক। আপনার এই ড্রয়িরুম আজ আমার কাছে কার্যত একটা বিচার কক্ষ। (একটুক্ষণ চুপ করে থেকে) অথচ আমিও আজ কিছুটা টেন্স্‌ড।

কৃষ্ণান: বুঝছি। আপনি আজ খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন প্রফেসর গুণ্ডাপ্পা। নিন। শুরু করুন। টেনশন ছাড়ুন। আপনার লেখালেখিতে সব সময় একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। মনে হচ্ছে সেরকম কিছু ব্যাপার। তাই আমিও শুনতে উদগ্রীব। কেননা আমি আপনার একজন অনুরাগী পাঠক।

গুণ্ডাপ্পা: গত সপ্তাহে আমি একটা কাজে এই জেলারই নাগবল্লী নামের একটা গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসে গেছিলাম। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে হবে। ওই পঞ্চায়েতের অধীনের গ্রামগুলোতে কিছু বিরল পদবীর মানুষ আছে। সেইসব পদবী সংগ্রহ করা, তাদের উৎপত্তি, বিকাশ, সেই সব মানুষদের উপভাষা অর্থাৎ ডায়ালেক্ট ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যেই গেছিলাম। আমার কাজ তো ভাষার আঁকবাঁক নিয়ে।

কৃষ্ণান: হ্যাঁ। ভাষাবিজ্ঞানীর কাজটা অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো। তাইতো প্রফেসর?

গুণ্ডাপ্পা: অনেক সময়। সে থাক। সেদিন একটি রাতের জন্যে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ওই গ্রামেরই একটি

লোকের বাড়িতে। বাধ্য হয়েই আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কারণ সন্ধের আগেই উঠল প্রচন্ড ঝড়। সঙ্গে বজ্রপাত আর প্রবল বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। বৃষ্টি আর ঝড়ের থামার কোন লক্ষণ নেই। ভয়ানক দুর্যোগ। সেবার নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। ড্রাইভার ছিল না। আজকাল রাত্রে দৃষ্টির একটু সমস্যা হচ্ছে। একটু চিন্তায় পড়ে ছিলাম কিভাবে ফিরব ভেবে। সমস্যার সমাধান করল একটি লোক। পঞ্চায়েত সদস্য। নাম অর্জুন কারিয়াপ্পা। আমার অসহায় অবস্থা দেখে লোকটা একটা রাতের জন্যে ওর বাড়িতে সাদর আমন্ত্রণ করল। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। পেলাম আন্তরিক ব্যবহার, সুন্দর আতিথেয়তা, আকণ্ঠ ভোজন। জাস্টিস কৃষ্ণান, আমি ভাষার গবেষক। দলিত সম্প্রদায়ের উপভাষার ওপর অনেক কাজ করেছি, করছিও। কিন্তু সেদিন বুঝলাম এই বিচিত্র দেশের সমাজকে কতটুকুই বা জানি। কিছুই না। এত বিচিত্র এই দেশ। এত রীতি, প্রথা,বিশ্বাস, সংস্কার…… সেটা ছিল ঝড়ের রাত….. (নীরবতা)

(প্রথম ফ্ল্যাশব্যাক)

(কারিয়াপ্পার বাড়ি)

কারিয়াপ্পা: আসুন, বাবুজী। আসুন। গরীবের ঘরে আপনার মতো ব্রাহ্মণ মানুষের পায়ের ধুলো পড়ল। কী ভাগ্যি আমাদের। আমরা ধন্য হয়ে গেলাম বাবুজী।

গুন্ডাপ্পা: এসব কেন বলছ, কারিয়াপ্পা? এই প্রচন্ড দুর্যোগের রাতে আমার গাড়ি চালিয়ে ফেরা সম্ভব ছিল না। তুমি আমাকে আশ্রয় না দিলে আমি খুবই বিপদে পড়ে যেতাম। তোমার আমন্ত্রণের জন্যে বরং তোমাকেই আমার অনেক ধন্যবাদ জানানো উচিত।

কারিয়াপ্পা: একি বলছেন, বাবুজী! আশ্রয় কি বলছেন! আপনি ব্রাহ্মণ অতিথি। দেবতা। আমাদের সত্যিই পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন।

গুন্ডাপ্পা: দ্যাখো কারিয়াপ্পা, এসব ব্রাহ্মণ দেবতা এরকম সব কথা বলবে না। আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। মানুষকে কেন দেবতা বলছ? এরকম বলা ঠিক নয়।

কারিয়াপ্পা: না, বাবুজী। আপনি ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণ হলেন দেবতা। আমরা তাই মনে করি। আপনি দয়া করে রাগ করবেন না।

গুন্ডাপ্পা: না না। রাগ করছি না। বলছি আমি ওসব মানি না। মানে মানুষকে দেবতা মনে করি না। মানুষ মানুষই। দেবতা দেবতাই। যে যার জায়গায় আছে। মানুষকে দেবতা বানানো ঠিক নয়।

কারিয়াপ্পা: না না বাবুজী। আপনি যতই বলুন আমরা তাই মনে করি। দয়া করে রাগ করবেন না।

গুন্ডাপ্পা: আঃ কী মুশকিল! রাগ করার কথা উঠছে না।

(কারিয়াপ্পা ওর স্ত্রী শবরীকে ডাকে)

কারিয়াপ্পা: কই গো শবরী, এসো।

(শবরী ভেতর থেকে আসে মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে)

কারিয়াপ্পা: বাবুজী এসেছেন। ব্রাহ্মণ অতিথি মানুষ। দেব্‌তা। প্রণাম করো।

(শবরী ভূমিষ্ঠ হয়ে গুণ্ডাপ্পার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে যায়)

গুন্ডাপ্পা: আহাহাহা! একি করছেন! থাক। থাক।

কারিয়াপ্পা: না না বাবুজী। প্রণাম ফিরিয়ে দেবেন না। আর শবরীকে আপনি বলবেন না। ও খুব লজ্জা পাবে।

গুন্ডাপ্পা: আচ্ছা। ঠিক আছে।

গুন্ডাপ্পা: আর আমাকেও আপনারএকটু পায়ের ধুলো নিতে দিন।

গুন্ডাপ্পা: না-না-না-না-

(আপত্তি সত্ত্বেও স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই গুন্ডাপ্পার পায়ে মাথা

ঠেকিয়ে প্রণাম করে)

গুন্ডাপ্পা: দ্যাখো কারিয়াপ্পা আমি শুধুই একজন শিক্ষক মানুষ। কিছু গবেষণার কাজে এ গ্রামে এসেছিলাম। বিপদের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। বিপদের সময়ে তোমাদের সুন্দর আতিথ্যে আমি মুগ্ধ ও ভীষণ উপকৃত। এটাই যথেষ্ট। কিন্তু তোমরাএভাবে আমাকে দেবতা বলে আর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে আমি বিব্রত বোধ করি। আমি পছন্দ করছি না এ সব। আমার শিক্ষাদীক্ষা একটু অন্যরকম।

শবরী: বাবুজী, রাগ করবেন না। আপনি সত্যিই আমাদের দেব্‌তা। কারণ আপনি ব্রাহ্মণ। আমার স্বামী ঠিকই বলেছেন। আপনাকে সেবা করে আমাদের পুণ্য করতে দিন।

গুন্ডাপ্পা: আবার এসব কী বলছ? সেবা, পুণ্য এসব বলবে না। আমি ঠিক এরকম করে ভাবি না।

কারিয়াপ্পা: যাও। যাও। বাবুজীর হাত পা ধোয়ার জন্যে জলের বালতি, মগ, গামলা নিয়ে এসো।

শবরী: হ্যাঁ। হ্যাঁ। যাচ্ছি।

(শবরী ভেতরে চলে যায়)

গুন্ডাপ্পা: এখানে কেন? তোমাদের স্নানের ঘর নেই?

কারিয়াপ্পা: না, বাবুজী। আমরা বাড়ির পেছনে পুকুরে হাত পা ধুই, চান করি।

গুন্ডাপ্পা: তাহলে আমাকে পুকুরটা দেখিয়ে দাও। আমি যাই। হাত,পা ধুয়ে আসি।

কারিয়াপ্পা: এখন তো ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড় হচ্ছে। কী করে যাবেন?

গুন্ডাপ্পা: তাইতো। মুশকিল হল। তাহলে কী হবে?

কারিয়াপ্পা: আপনি কিছু ভাববেন না, বাবুজী। এখানেই হাত,পা ধোবেন। কোন অসুবিধা হবে না।

(ইতিমধ্যে শবরী জলের বালতি, গামলা, মগ নিয়ে আসে)

শবরী: বাবুজী, আপনার পাদুটো এই গামলাতে রাখুন।

গুন্ডাপ্পা: (খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়) এই গামলায় পা ধোবো? ঘর নোংরা হয়ে যাবে তো জল ছিটকে পড়লে।

কারিয়াপ্পা: কোন অসুবিধা হবে না, বাবুজী। শবরী ঘর মুছে দেবে।

(গুন্ডাপ্পা খুব ইতস্তত করে গামলায় পা দুটো রাখেন। শবরী মগে করে জল ঢালতে থাকে গুন্ডাপ্পার পায়ে)

গুন্ডাপ্পা: (বিব্রত হয়ে) একি করছ? আমাকে মগটা দাও। আমি ঢালছি।

শবরী: কোন অসুবিধা নেই, বাবুজী। ব্যস্ত হবেন না। এবার পা দুটো গামলা থেকে তুলে নিন।

(গুণ্ডাপ্পা পা দুটো গামলা থেকে তুলে নেয়। শর্বরী খোঁপা খুলে ওর চুল দিয়ে গুণ্ডাপ্পার পা মুছিয়ে দিতে যায়। গুণ্ডাপ্পা দ্রুত সরে যান।)

গুন্ডাপ্পা: একি বাড়াবাড়ি করছ? ছি ছি। আমার খুব খারাপ লাগছে। এখানে না এসে বরং ঝড়ের মধ্যে ফিরে গেলে ভালো হতো।

শবরী: বাবুজী, এমনকরে বলবেন না। আমাদের ভয়ানক পাপ হবে। (শবরী ডুকরে কাঁদে) বলবেন না বাবুজী। আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনি দেব্‌তা। আপনি রাগ করলে আমাদের ভীষণ পাপ হবে।

কারিয়াপ্পা: হ্যাঁ,বাবুজী। আপনি রাগ করলে আমাদের ভীষণ পাপ হবে।

গুন্ডাপ্পা: তোমরা সব আশ্চর্য মানুষ। আশ্চর্য তোমাদের এরকম বিশ্বাস। আমি একটা বাইরের লোক। অতিথি যদিও, তবুও তোমার স্ত্রী আমার পা ধুয়ে দিচ্ছে, মাথার চুল দিয়ে পা মুছে দিতে যাচ্ছে, – এসব একদম ভালো লাগছে না। কী করে বোঝাবো তোমাদের যে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি চলে যাব এখান থেকে। হ্যাঁ, চলে যাব। ঝড়ের মধ্যেই গাড়ি চালিয়ে চলে যাব। তোমরা শোনো। আমি চলে যাচ্ছি।

(গুন্ডাপ্পা চলে যেতে উদ্যত হয়। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই দৌড়ে

গিয়ে গুন্ডাপ্পার পা চেপে ধরে)

কারিয়াপ্পা: দয়া করুন, বাবুজী। দয়া করুন। এভাবে চলে যাবেন না।

শবরী: আপনি এভাবে চলে গেলে আমাদের ভীষণ অকল্যাণ হবে।

কারিয়াপ্পা: হ্যাঁ। শেষ হয়ে যাবো আমরা। আপনি না মানতে পারেন। আমরা তো মানি। আমরা তো বিশ্বাস করি।

গুন্ডাপ্পা: কী বিশ্বাস করো?

কারিয়াপ্পা: আপনি দেবতা। ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হলেন দেবতা।

গুন্ডাপ্পা: তোমাদের বিশ্বাস নিয়ে তোমরা থাকো। আমি চলে যাচ্ছি। পা ছাড়ো।

কারিয়াপ্পা: না। না। যাবেন না। বাইরে ভয়ানক দুর্যোগ হচ্ছে। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। আপনার ক্ষতি হয়ে গেলে আমরা অপরাধী হয়ে যাব।

শবরী: ভীষণ পাপ হবে আমাদের।

(স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই কাঁদে)

গুন্ডাপ্পা: (নরম হয়ে) আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে কান্নাকাটি করার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি না। তবে এসব বোলো না।

কারিয়াপ্পা: বাবুজী, আপনি চৌকিতে এই আসনে বসে খেয়ে নিন। অনেক রাত হয়ে গেছে। (চৌকিতে আসন পেতে দেয়। গুন্ডাপ্পা আসনে বসে।)

কারিয়াপ্পা: যাও। যাও। বাবুজির জন্যে খাবার নিয়ে এসো।

শবরী: হ্যাঁ যাচ্ছি। (ভেতরে চলে যায়)

গুন্ডাপ্পা: তোমার পরিবারে আর কে কে আছে?

কারিয়াপ্পা: (মাটিতে বসে)আমাদের এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়ে বড়। ছেলে ছোট।

গুন্ডাপ্পা: আচ্ছা। লেখাপড়া করে তো?

কারিয়াপ্পা: ছেলেটা লেখাপড়া করে।

গুন্ডাপ্পা: মেয়ে পড়াশোনা করে না?

কারিয়াপ্পা: না।

গুন্ডাপ্পা: কেন?

কারিয়াপ্পা: বাবুজী, আমাদের জাতের মেয়েরা পড়াশোনা করে না।

গুন্ডাপ্পা: (আশ্চর্য হয়ে) কেন?

কারিয়াপ্পা: বাবুজী, আমাদের জাতের মেয়েরা পড়াশোনা করলে পরিবারের অকল্যাণ হয়। তাই করে না।

গুন্ডাপ্পা: (প্রচণ্ড আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়ে) এ আবার কী কথা?

কারিয়াপ্পা: হ্যাঁ, বাবুজী। আমাদের জাতের মেয়েদের লেখাপড়া করতে নেই। মেয়েরা লেখাপড়া করে না আমাদের জাতে।

গুন্ডাপ্পা: আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত কথা শুনতে হবে এই যুগে আমি ভাবতে পারিনি। এই গ্রামেতে তোমাদের জাতের কোন পরিবারের কোন মেয়ে কি তাহলে পড়াশোনা করে না?

কারিয়াপ্পা: না, বাবুজী।

গুন্ডাপ্পা: আশ্চর্য। এই গ্রামে কি তাহলে মেয়েদের কোন স্কুল নেই?

কারিয়াপ্পা: না, বাবুজী।

গুন্ডাপ্পা: তুমি পঞ্চায়েতে আছ। তুমি কেন উদ্যোগ নাও নি মেয়েদের স্কুল খোলার জন্যে? আর তুমি কী করেই বা উদ্যোগ নেবে? তুমি তো নিজেই বলছ তোমাদের জাতে মেয়েদের পড়লে অকল্যাণ হয়। ছেলেমেয়েদের ডাকো। ওদের সঙ্গে আলাপ করি।

কারিয়াপ্পা: হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। গিরিশ! চেন্নী! এখানে আয়।

(ছেলেমেয়ে দুটো আসে)

কারিয়াপ্পা: বাবুজিকে প্রণাম কর।

(ওরা প্রণাম করে)

গুন্ডাপ্পা: থাক থাক। তোমার নাম গিরিশ? কোন ক্লাসে পড়?

গিরিশ: ক্লাস টেন এ।

গুন্ডাপ্পা: আর তুমি চেন্নী?

(চেন্নী মাথা নাড়ে)

গুন্ডাপ্পা: এর চোখে মুখে যথেষ্ট বুদ্ধির ছাপ। অথচ একে লেখাপড়া শেখালে না! আশ্চর্য সংস্কার!

গিরিশ: আমি তো কতবার বাবাকে বলেছিলাম দিদিকেও ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে। বাবাতো কিছুতেই রাজি হয়নি

কারিয়াপ্পা: তুই থাম।

গিরিশ: দিদিও রাজি হয়নি।

গুন্ডাপ্পা: আশ্চর্য। তুমি কেন রাজি হওনি চেন্নী স্কুলে পড়তে?

চেন্নী: বাবা তো বলল বাবুজি। ইস্কুলে মেয়েরা পড়লে পরিবারের অকল্যাণ হয়।

গুন্ডাপ্পা: ওটা তো তোমার বাবার শেখানো কথা। তোমার নিজের কি মনে হয়?

চেন্নী: আমার কিছু মনে হয় না বাবুজি।

গুন্ডাপ্পা: নিশ্চয় কিছু মনে হয়। তোমাকে ছোটবেলা থেকে যা বোঝানো হয়েছে তাই তুমি তোতা পাখির মতো বলছ। সত্যি করে বলোতো তোমার কি ইচ্ছে হয় নি স্কুলে যেতে? ভায়ের মতো লেখাপড়া শিখতে? বই টই পড়তে?

চেন্নী: না বাবুজি।

গিরিশ: না না বাবুজি। দিদি মিছে কথা বলছে। আসলে ওর খুবই ইচ্ছে হয়।

চেন্নী: না না বাবুজি। ভাই মিছে কথা বলছে।

গিরিশ: না বাবুজি। দিদি মিছে কথা বলছে।

চেন্নী: তুই থামবি গিরিশ?

গুন্ডাপ্পা: কী স্যাড ব্যাপার!

গিরিশ: কেন থামব? তুই কি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখিস না? আমি নিজে একদিন দেখেছি। আমার

একটা বই হাতে নিয়ে তুই ঝর ঝর করে কাঁদছিস। আর বিড়বিড় করে বলছিস ''না না মেয়েদের এই বই টই পড়তে নেই। লেখাপড়া শিখতে নেই। লেখাপড়া শিখলে পরিবারের অকল্যাণ হবে। আমার ভাইয়ের অকল্যাণ হবে।'

চেন্নী: (কেঁদে ফেলে) তুই কি থামবি গিরিশ?

গিরিশ: না থামবো না। বাবুজি, দিদিকে বলো না আমার সঙ্গে স্কুলে পড়তে। বাবাকে রাজি করাও না গ্রামের স্কুলে যেন দিদিকে ভর্তি করে দেয়।

কারিয়াপ্পা: আহ্। গিরিশ। জ্বালাসনি বাবা। আমরা নীচু জাত। আমাদের ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া করতে নেই।

গিরিশ: আমরা নীচু জাত কেন বাবা? আমরা সবাই তো এই স্বাধীন দেশের মানুষ। কেন কেউ উঁচু জাত? আবার কেউ নিচু জাত, দলিত জাত আমাদের মতো? এইতো সেদিন ইস্কুলে আমাদের একটা গান শেখানো হল। আমার একজন মাস্টারমশাই গানটা গেয়ে গেয়ে আমাদের শেখালেন। ওই গানটাতে তো উঁচু জাত নিচু জাতের কথা নেই। ব্রাহ্মণ আর দলিতের কথা নেই। বাবুজি শুনবে গানটা?

কারিয়াপ্পা: তুই যা। এখন বাবুজিকে গান শুনিয়ে বিরক্ত করবি না।বাবুজি এখন খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নেবেন।

গুন্ডাপ্পা: না না। করুক না গানটা। আমি গান শুনতে ভালবাসি। গাও তুমি। আমি শুনি।

(গিরিশ গান ধরে। মিলে সুর মেরা তুম হারা। গুন্ডাপ্পা গলা মেলায়। ওদের গান শেষ হয়ে গেলে চেন্নীকেও গুন্ডাপ্পা গান গাইতে বলে।)

গুন্ডাপ্পা: তুমিও একটা গান করো চেন্নী। পারবে না গাইতে?

গিরিশ: হ্যাঁ। হ্যাঁ। দিদিও গান গাইতে পারে। গাও না দিদি। সেই ভজনটা। একদিন গুন গুন করে গাইছিলে পুকুর ঘাটে।

গুন্ডাপ্পা: হ্যাঁ। হ্যাঁ। গাও। গাও। শুনব।

কারিয়াপ্পা: মেয়েছেলে গান গাইলে অকল্যাণ হবে। ওকে

বলেছি অনেকবার। ও আমার কথা শুনতে চায় না।

গুন্ডাপ্পা: তুমি থামো তো। সবকিছুতেই অকল্যাণ আর অকল্যাণ। horrible। মেয়েরা লেখাপড়া করলে অকল্যাণ – গান গাইলে অকল্যাণ। কে বলেছে এসব কথা?

কারিয়াপ্পা: তাই তো জানি বাবুজী।

গুন্ডাপ্পা: ভুল জানো। ওসব ভুল কথা। সবসময় একটা ভয় তোমাদের তাড়া করে বেড়ায়। এইসব কথা বোলো না। গাও চেন্নী। তুমি গাও।

চেন্নী: যদি পাপ হয় বাবুজি?

গুন্ডাপ্পা: হবে না। আমি বলছি।

চেন্নী: ঠিক বাবুজি। আপনি বললে হবে না। আপনি তো দেবতা।

গুন্ডাপ্পা: কী মুশকিল! তুমিও দেখছি তোমার বাবা মায়ের মত কথাবার্তা বলছো। ওসব বলো না।

চেন্নী: না না বাবুজি। আপনি দেবতা।

কারিয়াপ্পা: ঠিক ঠিক। বাবুজী ব্রাহ্মণ মানুষ। বাবুজি তো দেবতাই। চেন্নী ঠিকই বলেছে।

গুন্ডাপ্পা: তোমাদের বুঝিয়ে পারা যাবে না।

গিরিশ: বাবুজি আমার কাছে দেবতা কিন্তু বিরাট কোহলি।

গুন্ডাপ্পা: (হেসে ফেলে) এটা ভালো বলেছ। ঠিক আছে চেন্নী। ভজনটা গাও শুনি।

(চেন্নী ভজন গান করে। গান শেষ হলে গুন্ডাপ্পা হাততালি দেয়। চেন্নী লজ্জা পেয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে যায়।)

(শবরী থালায় খাবার নিয়ে আসে। গুন্ডাপ্পার সামনে রাখে।)

কারিয়াপ্পা: খেয়ে নিন, বাবুজী।

(গুন্ডাপ্পা খেতে শুরু করেন। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে আলো নিভে যায়।)

(আলো জ্বলে। গুন্ডাপ্পার খাওয়া হয়ে গেছে)

গুন্ডাপ্পা: প্রচুর খাওয়ালে কারিয়াপ্পা। এবার তো আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। ঘুমোতে হবে। সারাদিন অনেক পরিশ্রম হয়েছে।)

কারিয়াপ্পা: হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুজি চলুন। আপনাকে পৌঁছে দিই যে ঘরে আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে।

(ধীরে আলো নিভে যায়।)

(প্রথম ফ্ল্যাশব্যাক শেষ)

(জাস্টিস কৃষ্ণানের ড্রইংরুম)

গুন্ডাপ্পা: খাওয়া দাওয়া শেষ করে শোয়ার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে গেছি। গৃহস্বামী কারিয়াপ্পাই ওই ঘরে পৌঁছে দিল আমাকে। পশ্চিম দিকের একটা ছোট ঘর। একটা জানলা খোলা। ঝড়ের রাত। বৃষ্টি পড়ছে। তবে বৃষ্টির ছাট আসছে না। কিন্তু বাইরে হাওয়ার প্রবল মাতামাতি। গ্রামেতে ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই। মনে হয় ঝড়ের জন্যেই কারেন্ট নেই। একটা কেরোসিনের কূপী মৃদু মৃদু জ্বলছে। আমি দরজা বন্ধ করে, পোশাক বদলে সবে শুয়েছি। আমার এক প্রস্থ রাতের পোশাক আমার ব্রীফকেসে সবসময় থাকে। একটু তন্দ্রা এসেছিল। এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত। আমি একটু অবাক হয়ে দরজা খুলে দিই। দেখি কারিয়াপ্পার সেই মেয়ে চেন্নী দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ঘরে ঢুকে আমি কোন প্রশ্ন করার আগেই নিঃসংকোচে দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে দিল। আর আমাকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে নির্দ্বিধায় যে প্রশ্ন আমাকে করল, তা উচ্চারণ করতে যে কোন ভদ্রজনই লজ্জিত হবেন। তবু তার কথা তো তার মতো করেই বলতে হবে আপনাকে। নাহলে আমার বিবরণ অসম্পূর্ণ হবে। মেয়েটি তার রিনরিনে কণ্ঠে স্মিতমুখে বলল...

।। দ্বিতীয় ফ্ল্যাশব্যাক।।

চেন্নী: বাবুজী, আমাকে চাই তো আপনার?

গুন্ডাপ্পা: (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে) মানে? তোমাকে চাই মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?

চেন্নী: (একটু অবাক হয়ে) আজ রাতে আপনার সেবার জন্যে?

গুন্ডাপ্পা: (চমকে উঠে) কী?

চেন্নী: (আরও অবাক হয়ে) বুঝলেন না বাবুজি? আমি মেয়েমানুষ। আরো খোলসা করে বলতে যে আমার লাজ লাগছে।

গুন্ডাপ্পা: (ক্রুদ্ধ হয়ে) তুমি কি বলতে চাইছ? এত রাতে তোমার মতো যুবতী মেয়ে পরপুরুষের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে... ছি ছি... তুমি চলে যাও। কীসের সেবা? আমার কোন সেবাটেবার দরকার নেই।

চেন্নী: (ত্রস্ত হয়ে) না,না। রাগ করবেন না বাবুজী। আপনি অতিথি। কুলীন ব্রাহ্মণ। আপনি রাগ করলে দেবতার কোপ হবে আমাদের ওপর। আমাকে কি ভালো লাগছে না বাবুজী? আমি কি স্নান করে আসব?

গুন্ডাপ্পা: কী সব বলছ? তোমাকে বলছি তুমি যাও।

চেন্নী: (কাঁদো কাঁদো হয়ে) আপনি রাগ করছেন কেন বাবুজি? আমি তো আপনাকে সুখ দিতে এসেছি। আজ সারারাত আপনি আমাকে.....

গুন্ডাপ্পা: ছি ছি ছি। থামো। থামো। তোমার এসব কথা বলতে লজ্জা করছে না?

চেন্নী: (অত্যন্ত অবাক হয়ে) কেন বাবুজী?

গুন্ডাপ্পা: কেন? তুমি কী? ইস। তুমি একটা অত্যন্ত বাজে মেয়ে। এত খারাপ স্বভাব তোমার!

চেন্নী: আপনি এসব কী কটু কথা বলছেন বাবুজি?

গুন্ডাপ্পা: তুমি পাগল না শয়তান?

চেন্নী: (ক্রুদ্ধ হয়ে) আপনি কেন আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন?

গুন্ডাপ্পা: গালাগালি দেব না তো কি ভাল বলব? তোমার এই

স্বভাবের কথা বাড়ির লোক জানে? তোমার বাবাকে ডেকে বলব? নাকি এটা একটা ফাঁদ? তাই তো মনে হয়। এই শোনো – তোমার বাবা-মা কি তোমায় এখানে পাঠিয়েছে?

চেন্নী: হ্যাঁ। কেন?

গুন্ডাপ্পা: (স্তম্ভিত হয়ে) ও। এই জন্যে এত খাতির করে আমাকে এখানে আনা? এটা প্রস্টিটিউটের বাড়ি! ইস।এই তুমি দরজা থেকে সরো। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব।

চেন্নী: (কেঁদে ফেলে) (অত্যন্ত ভীত হয়ে) না না বাবুজি। এই ঝড়ের রাতে আপনি যাবেন না। আপনার বিপদ হলে দেবতা আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমাদের অকল্যাণ হবে। আমরা শেষ হয়ে যাব। আমার বাবা মা ছোট ভাই – আমাদের সকলের সর্বনাশ হবে।

গুন্ডাপ্পা: ন্যাকামি করবে না। কাঁদছ! আমার বিপদ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। এরকম খারাপ প্রস্তাব করতে লজ্জা করে না? তুমি একটা অত্যন্ত খারাপ মেয়ে। তোমরা খুব খারাপ।

চেন্নী: (কাঁদতে কাঁদতে) কীসব বলছেন? (উত্তেজিত হয়ে প্রবল চিৎকার করতে থাকে) আপনি কেন বারবার আমাকে খারাপ বলছেন – আমাদের খারাপ বলেছেন?

গুন্ডাপ্পা: (শ্লেষের সাথে) এঃ বলবেনা! তুমি, তোমরা খারাপ নয়ত কি ভালো?

চেন্নী: (কাঁদতে কাঁদতে) হ্যাঁ। ভালো। ভালো। গ্রামের সবাই জানে আমি ভালো – আমরা ভালো। সবাই জানে। সবাই।

গুন্ডাপ্পা: বাইরে থেকে জানে। যদি জানতো ভেতরটা এতো সাংঘাতিক নোংরা – ছিঃ –

চেন্নী: (কাঁদতে কাঁদতে) কেন খারাপ নোংরা এসব বলছেন আপনি? আমি কি দোষ করেছি?

গুন্ডাপ্পা: অদ্ভুত! দারুন শিক্ষা পেয়েছ তো বাবা-মার কাছ থেকে! কোনটা খারাপ তাও বোঝো না। শোনো। তোমার সদ্য যৌবন এসেছে। তাই তোমার বাড়ি তোমায় খুব খারাপ পথে নামিয়ে দিয়েছে। কেননা তোমার বাড়ি খুব খারাপ। তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা-মা ব্যবসা করছে। তুমি এসব বোঝোনা মনে হচ্ছে। তোমার বাড়ির কথায় এসব কোরো না। যাও।

চেন্নী: (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে) বাবুজি, আপনি এসব কি বলছেন? আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ অতিথি। অতিথি নারায়ন। আপনাকে সেবা করা, সুখ দেওয়াই তো আমার ধর্ম বাবুজি। আমি যে বাসবী।

গুন্ডাপ্পা: (বুঝতে না পেরে) বাসবী? তুমি বাসবী মানে?

চেন্নী: বাসবী কী আপনি জানেন না বাবুজি? যে সব মেয়েদের দেবতার কাছে সঁপে দেওয়া হয়, তাদের বাসবী বলে বাবুজী।

গুন্ডাপ্পা: দেবতার কাছে সঁপে দেওয়া বলতে?

চেন্নী: আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল আমার। তখন দেবতার পায়ে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছিল।

।। দ্বিতীয় ফ্ল্যাশব্যাক শেষ।।

।। তৃতীয় ফ্ল্যাশব্যাক।।

(মন্দির)

কারিয়াপ্পা: পুরুত মশাই, রক্ষা করুন আমার মেয়েকে.। রক্ষা করুন ওকে ঠাকুর মশাই।

শবরী: হ্যাঁ, ঠাকুর মশাই। আপনিই পারেন আমাদের মেয়ে কে বাঁচাতে। ভীষণ কঠিন অসুখে ভুগছে ও। আপনি না বাঁচালে ও কিছুতেই বাঁচবে না পুরুত মশাই।

পুরোহিতঃ ওরে অবোধ, আমি কেউ নয় বাবা। সবকিছুই দেবতার হাত। ঠাকুরের হাত।

কারিয়াপ্পা: আপনি ঠাকুরকে বলুন আমাদের মেয়েকে

বাঁচাতে। ওকে সুস্থ করে তুলতে। আপনার কথা দেবতা নিশ্চয় শুনবেন।

শবরী: অতটুকু ছোট্ট মেয়ে আমার। ওর কষ্ট দেখে আমাদের বুক ফেটে যায়। সারাদিন আমরা শুধু চোখের জল ফেলি। রক্ষা করুন পুরুত মশাই আমাদের মেয়েকে। রক্ষা করুন ওর জীবন।

পুরোহিতঃ তাহলে শোন কারিয়াপ্পা। তোদের মেয়ের জীবন যদি রক্ষা করতে চাস তাহলে তোদের মেয়েকে দেবতার পায়ে সঁপে দে। তোদের মেয়েকে বাসবী করে দে। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। দেবতা তাহলে তোদের মেয়ের জীবন রক্ষা করবে।

কারিয়াপ্পা: বাসবী?

পুরোহিতঃ হ্যাঁ। বাসবী। তোরা কি রাজি আছিস?

কারিয়াপ্পা: ঠিক আছে পুরুত মশাই। আমরা রাজি। আমাদের মেয়ে কে বাঁচাতেই হবে।

পুরোহিতঃ বাসবী হলে কিন্তু ওর আর কোনদিন বিয়ে দেওয়া যাবে না কারিয়াপ্পা। ওর আর কোনদিন বিয়ে হবে না।

শবরী: সে কি? আর কোনদিন বিয়ে হবে না?

পুরোহিতঃ না। বাসবী মানে তো ওর সঙ্গে দেবতার বিয়ে হয়ে গেল। ও হয়ে গেল দেবতার কাছে সঁপে দেওয়া নৈবেদ্য। দেবতার ভোগের সামগ্রী।

কারিয়াপ্পা: ঠিক আছে। আমরা রাজি। বাসবী হলে যদি ওর জীবন রক্ষা হয় তাহলে ওকে বাসবী করে দিন।

শবরী: কী বলছ তুমি?

কারিয়াপ্পা: ঠিকই বলছি শবরী। এছাড়া আমাদের মেয়েকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই।

পুরোহিতঃ কিন্তু আর একটা কথা। সেটাও মেনে নিতে হবে।

কারিয়াপ্পা: কী?

পুরোহিতঃ কোনো ব্রাহ্মণ যদি তোদের বাড়িতে কখনো

অতিথি হয় তার সেবার জন্য তোদের মেয়েকে তার কাছে রাতের বেলায় পাঠাতে হবে। তার ভোগের জন্যে।

শবরী: (আঁতকে ওঠে) সে কি!

পুরোহিতঃ হ্যাঁ। কেননা ব্রাহ্মণ হল দেবতা। আর দেবতার পায়ে তোরা তোদের মেয়েকে সঁপে দিয়েছিস দেবতার ভোগের জন্যে। তাই সেই অতিথি ব্রাহ্মণের ভোগের জন্যে রাতের বেলায় তোদের মেয়েকে তার কাছে সঁপে দিতে হবে। তা না দিলে দেবতার অপমান হবে। তখন তোদের ওপর দেবতার ভয়ানক অভিশাপ নেমে আসবে। আর তোদের পরিবারের চরম অকল্যাণ হবে। তাই তোদের মেয়ে বড় হয়ে রজস্বলা হলে তাকে এটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। পারবি তো তোরা?

কারিয়াপ্পা ও শবরী: (কাঁদতে কাঁদতে) হ্যাঁ পারব।

পুরোহিতঃ (ক্রমশ চোখ রক্তিম ও গলার স্বর হিংস্র আর তীব্র হয়ে যায়। ভয় দেখাতে থাকে।) একবার মেয়েকে বাসবী করে দিলে আর ফেরার উপায় থাকবে না। ভবিষ্যতে তোদের মেয়ে বড় হলে যদি এসব না মানে, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তোদের পরিবারের। ধ্বংস হয়ে যাবি তোরা। শেষ হয়ে যাবি তোরা। কথার খেলাপ হলে দেবতার চরম অপমান হবে। তখন দেবতার কোপে তোরা সবাই শেষ হয়ে যাবি। তোদের বংশ লোপাট হয়ে যাবে।

কারিয়াপ্পা ও শবরী: (প্রচণ্ড ভীত হয়ে) না না। কথার খেলাপ হবে না।

পুরোহিতঃ তোদের মেয়ের পরে তোদের একটা ছেলে আছে তো?

কারিয়াপ্পা ও শবরী: হ্যাঁ পুরুত মশাই।

পুরোহিতঃ দেবতাকে ঠকালে তাকেও বাঁচাতে পারবি না।

কারিয়াপ্পা ও শবরী: (প্রচণ্ড ভীত হয়ে) না না। দেবতাকে ঠকাবো না আমরা।

পুরোহিতঃ হ্যাঁ। এটা সারাজীবন মনে রাখবি। আর মেয়ে বড়

হলে তাকেও বলবি এটা সারা জীবন মনে রাখতে। তোদের মেয়ের বিয়ে না হলে কোন ক্ষতি নেই। ছেলে বড় হলে তার বিয়ে দিবি। তোদের বংশ রক্ষা হবে।

কারিয়াপ্পা ও শবরী: হ্যাঁ, পুরুত মশাই।

পুরোহিতঃ তাহলে কাল সকালে ঠাকুরের পুজোর সময় তোদের মেয়েকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে নিয়ে আসবি। কাল সকালেই তোদের মেয়েকে বাসবী করে দেব।

।। তৃতীয় ফ্ল্যাশব্যাক শেষ।।

চেন্নী: সেই থেকে আমি বাসবী বাবুজি। যারা বাসবী, তাদের তো কুলীন ব্রাহ্মণ অতিথিকে দেহ দিয়ে সেবা করতেই হবে। অতিথি যে দেবতা। আমরা যে দেবতার দাসী। আপনি আমাকে নিন বাবুজি। নিয়ে সুখী হোন। নাহলে দেবতার কাছে কথার খেলাপ হয়ে যাবে আমাদের। আমাদের অকল্যাণ হবে। বাবা-মা ভাই সকলের অকল্যাণ হবে। আমাকে নিন বাবুজি।

গুন্ডাপ্পা: থামো। থামো। ছি ছি। মূর্খ মেয়ে। কল্পনা করতে পারি না এসব এই সভ্য যুগে। কী অদ্ভুত খারাপ নিয়ম তোমাদের। শোনো এ যুগে এসব চলে না। এভাবে যেসব মেয়েরা পরপুরুষের হাতে নিজেদের তুলে দেয়, তাদের গণিকা বলে, পতিতা বলে, বেশ্যা বলে। বেশ্যাদের কথা শোনো নি তুমি? জানো না তারা টাকা নিয়ে পরপুরুষের কাছে নিজেদের দেহ বিক্রি করে? জানো না সমাজ তাদের ঘৃণা করে? তুমিও তাহলে সেরকম পতিতা বেশ্যা?

চেন্নী: (আর্তনাদ করে) না। না। ওরকম বলবেন না বাবুজি। হ্যাঁ। আমি ওরকম মেয়েদের কথা জানি। তারা শরীর বেচে পয়সা নেয়। টাকা নিয়ে নিজেদের শরীর বিক্রি করে। আমি তা নই বাবুজি। (হাউ করে হাউ করে কেঁদে ফেলে) আমি তো বাসবী। আমি তো কোন পয়সা পেতে আসিনি। আমি তো এসেছি আপনার সেবার জন্য।

গুন্ডাপ্পা: থামো। ওই একই হল। পতিতা শরীর বেচে পয়সা

নেয়। তুমি শরীর বেচে তোমার বাড়ির, তোমার নিজের নিরাপত্তা কিনছ। দেবতার আশীর্বাদ কিনছ। তুমি খারাপ হয়ে গেছ। পতিতার লাইনে নেমে গেছ। তুমি বুঝতে পারছ না।

চেন্নী: (প্রচন্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে) কিন্তু বড় হওয়া থেকে যে আমি জেনে এসেছি আমাকে এসব করতে হবে। শুনে আসছি আমি বাসবী। তাই আমাকে কুলীন ব্রাহ্মণ অতিথিকে দেহ দিয়ে সেবা করতে হবে। হ্যাঁ। আমাদের সমাজে এটাই নাকি নিয়ম বাবুজি। বাসবীকে শরীর দিতেই হবে তার কুলীন ব্রাহ্মণ অতিথিকে। আপনি শহরের কুলীন ব্রাহ্মণ। অথচ আপনিই আমাকে পতিতা বলছেন। বেশ্যা বলছেন। তাহলে তাহলে....(থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে অস্বাভাবিক আওয়াজ করতে থাকে মুখ দিয়ে)....

গুন্ডাপ্পা: তাহলে আর কি। তুমি একটা বোকা মেয়ে। অশিক্ষিত মেয়ে। লেখাপড়া শেখোনি। তাই ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যে বুঝিয়ে তোমাকে দিয়ে বেশ্যার কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু এভাবে বাড়ির কল্যাণ হয় না।তোমারও হয় না। এতে তোমার ক্ষতিই হচ্ছে। তোমার সর্বনাশ হচ্ছে।

চেন্নী: (প্রবলভাবে বিশ্বাস টলে যায়) তাই বাবুজি? আমি কি সত্যিই তাহলে পতিতা হয়ে গেছি?

গুন্ডাপ্পা: তাইতো। তুমি পতিতা ছাড়া আর কী?

চেন্নী: তাহলে আমার বাবা-মা এতদিন আমাকে ভুল বুঝিয়েছে? আপনারা শহরের বাবুরা তাহলে বাসবীদের পতিতা বলে মনে করেন? (অন্তর্দ্বন্দ্বে চুরমার হয়ে যায়) তাহলে দেবতা- ঠাকুর- আমার অসুখ সেরে যাওয়া - মানত - দেবতারা আদেশ - এসব মিথ্যে?

গুন্ডাপ্পা: তোমার অসুখ সেরে ছিল ওষুধ খেয়ে। আর যদি দেবতার আশীর্বাদেই অসুখ সেরে যায়, তা হলেই বা কি? দেবতা কি তোমাদের এরকম মানত করতে বলেছিল? তুমি নিজে শুনেছ? তোমরা নিজেদের কানে শুনেছ?

চেন্নী: মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর বলেছিল।

গুন্ডাপ্পা: (অত্যন্ত বিদ্রুপের সঙ্গে) পুরোহিত ঠাকুর বলেছিল!!

চেন্নী: হ্যাঁ। পুরোহিত ঠাকুর বলেছিল আমার বাবা-মাকে। বলেছিল মেয়েকে বাসবী করবে বলে মানত করো। তাহলেই মেয়ে সেরে উঠবে। তাই তো আমাকে –

গুন্ডাপ্পা: শোনো ওসব পুরোহিতদের শয়তানি। ধাপ্পাবাজি। তোমাদের সমাজের পুরুষদের শয়তানি। কুলীনদের শয়তানি। তোমাদের মতো অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের পরিবারের মেয়েদের ভোগ করার জন্য পুরোহিতদের তৈরি করা এসব শয়তানি নিয়ম, প্রথা। এসব নিয়ম ভগবানের তৈরি করা নয়। ভগবানের নিয়ম এরকম খারাপ হয় না। মেয়েদের সর্বনাশ কি ভগবান চাইতে পারেন? তার কাছে তো মেয়ে পুরুষ সবাই সমান। এসব নিয়মে কাদের লাভ হয় দ্যাখো। লাভ হয় লোভী শয়তান যত পুরোহিত কুলীন ব্রাহ্মণদের। তাই তারাই এইরকম নিয়ম তৈরি করেছে। আর যুগ যুগ ধরে দেবতার নামে এসব চালিয়ে আসছে। তুমি ঘরে যাও। নিজেকে এভাবে আর খারাপ পথে ঠেলে দিও না। নোংরা পথে ঠেলে দিও না।

চেন্নী: (ভেঙে পড়ে) তা হলেএসব নোংরা খারাপ! আমাকে ভুল বুঝিয়ে এরকম নোংরা পথে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে? বাবুজি, আমি তাহলে সত্যি খারাপ মেয়ে? নোংরা? পতিতা? আ আ আ আ আ আ (তীব্র বীভৎস আর্তনাদ করে দৌড়ে চলে যায়। দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।)

গুন্ডাপ্পা: চেন্নী চেন্নী চেন্নী....... দীর্ঘ নীরবতা।

(জাস্টিস কৃষ্ণানের ড্রইংরুম)

গুণ্ডাপ্পা: জাস্টিস কৃষ্ণান, একটা বীভৎস চাপা অথচ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে চেন্নী দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যেহেতু ওর আর্তনাদ খুব উচ্চগ্রামের ছিল না, তাই বাড়ির আর কারোর ঘুম ভাঙলো না। কেউ সাক্ষী থাকেনি তার এই মানসিক বিপ্লবের। শুধু আমি ছাড়া। ও ঘর ছেড়ে যাবার সময় আমি দেখলাম ওর চোখেমুখে এক অস্বাভাবিক ঘৃণা মিশ্রিত

উপলব্ধি। ঘৃণা, হতাশা, জিঘাংসা, অথচ একটা আলো। একটা চেতনার দ্যুতিও যেন ফুটে উঠেছিল ওর চোখে। ওর মাথা নাড়ায়, ওর অভিব্যক্তিতে। যেন চাবুকের একটা আঘাত কিংবা বিদ্যুতের একটা প্রবাহে একটা মাটির পুতুল থেকে একটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে গেল মেয়েটা। সরল অবোধ মূর্খ গ্রাম্যবালিকা থেকে হয়ে গেল একটা পোড় খাওয়া নারী। একটা ম্যাচিউরড উওম্যান। এক লহমায় ওর চোখ থেকে যেন যাবতীয় সংস্কারের মিথ্যে আবরণ ছিন্ন হয়ে সরে গেল।

কৃষ্ণান: এ তো ভালোই হলো। ও নিজেকে চিনতে পারল।

গুণ্ডাপ্পা: না জাস্টিস কৃষ্ণান। কদর্য বাস্তবের নির্মম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে সে একেবারে তলিয়েই গেল। সাঁতরে উঠতে পারল না। মেয়েটা সেই রাতেই আত্মহত্যা করল।

কৃষ্ণান: সেকি!

গুণ্ডাপ্পা: হ্যাঁ। জাস্টিস কৃষ্ণান। সেই রাতই ছিল তার শেষ রাত। মেয়েটা চিলেকোঠার ঘরে গলায় দড়ি দিল।

।। চতুর্থ ফ্ল্যাশব্যাক।।

(সকাল হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। গুণ্ডাপ্পা ব্রিফকেস নিয়ে ভেতর থেকে মঞ্চে আসেন। নেপথ্যে কান্নার আওয়াজ।)

গুণ্ডাপ্পা:.......(আপন মনে) কে কাঁদছে? কারিয়াপ্পা! কারিয়াপ্পা!

(শোকার্ত ও বিধ্বস্ত কারিয়াপ্পা টলতে টলতে ভেতর থেকে আসে)

গুণ্ডাপ্পা: কারিয়াপ্পা, সকাল হয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টিও থেমে গেছে। এবার আমি যাবো।

কারিয়াপ্পা: হ্যাঁ। বাবুজী।

গুণ্ডাপ্পা: কী হয়েছে তোমাদের? তোমরা সবাই কাঁদছ কেন?

কারিয়াপ্পা: (প্রবল ভাবে কেঁদে ফেলে) আমার মেয়ে চেন্নী রাতের বেলায় চিলেকোঠায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী

হয়েছে।

গুণ্ডাপ্পা: সেকি!

(শবরী আর্তনাদ করতে করতে ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে ভেতর থেকে আসে। পেছন পেছন গিরিশও ভীষণ কাঁদতে কাঁদতে আসে।)

শবরী: আ আ আ আ আ আ। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল বাবুজী। চেন্নী আর নেই। আমার মেয়েটা আর নেই।

গিরিশ: (প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) দিদি রে। দিদি গো। আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেলি!

কারিয়াপ্পা: (কাঁদতে কাঁদতে) বাবুজী। চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিই।

(গুণ্ডাপ্পার চোখেমুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে)

গুণ্ডাপ্পা: না না। এ সময় তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই যাচ্ছি।

শবরী: না বাবুজী। আপনি যাবেন না। (পাগলের মত হয়ে যায়। ওর দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে যায়) আপনাকে বলতে হবে কেন মরল আমার মেয়েটা। কেন ও হঠাৎ গলায় দড়ি দিল? কী হয়েছিল রাতের বেলায় বাবুজী? আপনার ঘর থেকে কেন ওর চেঁচামেচি কান্নাকাটি ভেসে আসছিল মাঝরাতে? কেন? কেন? কেন ও ভীষণ চেঁচিয়ে উঠেছিল? কীসের তর্ক বিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছিল ওর সঙ্গে আপনার বাবুজী? আপনি ওকে কি বলেছিলেন? বলুন। বলুন। বলতে হবে আপনাকে।

গুণ্ডাপ্পা: তার আগে বলো গভীর রাতে ও কেন আমার ঘরে গেছিল। একজন যুবতী মেয়ে হয়ে পরপুরুষের ঘরে কেন ও রাতের বেলায় গেছিল? কারা পাঠিয়েছিল ওকে আমার ঘরে? কেন ও গেছিল আমার ঘরে মাঝরাতে?

শবরী: ওতো বাসবী। ওকে তো আপনার ঘরে যেতে হবেই রাতের বেলায়। কেননা আপনি ব্রাহ্মণ অতিথি। দেবতা। ও বাসবী। ও যদি না যেত তাহলে আমাদের পরিবারের চরম অকল্যাণ হোত।

গুণ্ডাপ্পা: থামো মূর্খের দল। এখন কি তোমাদের পরিবারের কল্যান হল? লজ্জা করে না তোমাদের নিজেদের মেয়েকে পরপুরুষের কাছে রাতের বেলায় পাঠাতে তার ভোগের জন্যে? আমি সব শুনেছি চেন্নীর কাছে। তাকে বলেছি এভাবে নিজেকে নষ্ট করা উচিত নয়। বলেছি তাকে এই পথ থেকে সরে যেতে। বলেছি তাকে এটা পতিতার পথ। এটা পতিতাগিরি।

শবরী: (গুন্ডাপ্পার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর জামাটা খামচে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকাতে থাকে) পতিতা? পতিতা? পতিতা? আমাদের মেয়ে পতিতা? আমাদের মেয়ে পতিতা? আমাদের মেয়ে পতিতা? পরিবারের কল্যাণের জন্য নিজেকে ব্রাহ্মণ দেবতার কাছে সঁপে দেওয়াকে পতিতাগিরি বলে?

গুণ্ডাপ্পা: হ্যাঁ। হ্যাঁ। একে পতিতাগিরিই বলে। নিজের দেহকে পরের কাছে এভাবে তুলে দেওয়াকে পতিতাগিরিই বলে। পরিবারের কল্যাণের নাম করে হলেও একে পতিতাগিরিই বলে।

শবরী: আপনি ব্রাহ্মণ। দেবতা।চেন্নী বাসবী হয়ে আপনার কাছে গেছিল বলে তাকে পতিতা বলছেন?

গুণ্ডাপ্পা: হ্যাঁ বলছি। বলছি। আমি দেবতা নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ তোমাদের মতো। তোমরা মূর্খ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণ পুরুতের মিথ্যে কথায় নিজেদের মেয়েকে সারাজীবনের জন্যে পতিতা বানিয়ে দিয়েছ। তাকে আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে দাওনি। তাকে লেখাপড়া শেখাওনি। তাকে বিয়ে করে সুখী হতে দাওনি। তাকে শিখিয়েছ সারা জীবন ধরে বেশ্যবৃত্তি করতে। তাকে শিখিয়েছ ব্রাহ্মণদের কাছে নিজের শরীর বেচে দিতে। পরিবারের অকল্যাণের ভয় দেখিয়ে। তোমরা অমানুষ। তোমরা নিজেদের মেয়েকে বেশ্যা বানিয়েছ। আর সেটা সে বুঝতে পেরেই ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়েছে। তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী তোমরা তোমরা তোমরা।

শবরী: (কারিয়াপ্পাকে) শুনছ? সব শুনছ? তুমি কিছু বলো। বলো। বলো। (শবরী কান্নায় ভেঙে পড়ে কারিয়াপ্পার জামাটা

খামচে ধরে)। আমাদের মেয়ে কি সত্যিই পতিতা ছিল? ও কি পতিতাগিরি করত? বলো। বলো।

কারিয়াপ্পা: (কান্নায় ফেটে পড়ে) জানি না। জানি না। বুঝতে পারছি না। আমাদের তো বলা হয়েছিল বাসবী বলে ওকে নিজেকে সঁপে দিতে হবে ব্রাহ্মণ অতিথির কাছে। কিন্তু বাবুজী তো বলছে ও পতিতা। ও সারা জীবন পতিতাগিরি করেছে।

শবরী: (কান্নায় ফেটে পড়ে) এটা সত্যি না মিথ্যে? বলো। বলো।বলো।

কারিয়াপ্পা: (কান্নায় ফেটে পড়ে) জানি না। জানি না। জানি না।

শবরী: (কান্নায় ফেটে পড়ে) হায় ভগবান। জীবন চলে গেল আমার মেয়ের। কিন্তু মরার আগে ও জেনে গেল ও পতিতা। হায় ভগবান।

গিরিশ: হায় ভগবান। আমার দিদি পতিতা। আমার দিদি পতিতা। হায় ভগবান। হায় ভগবান।

(ওরা তিনজন প্রবল কাঁদতে থাকে। গুণ্ডাপ্পা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।)

(চতুর্থ ফ্ল্যাশব্যাক শেষ)

(জাস্টিস কৃষ্ণানের ড্রইংরুম)

গুণ্ডাপ্পা: মিস্টার কৃষ্ণান, আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা আমি কি আইনের চোখে চেন্নীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী?

কৃষ্ণান: ওর বাড়ির কেউ কি আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেছে পুলিশের কাছে?

গুণ্ডাপ্পা: ওই ঘটনার পর একটি সপ্তাহ চলে গেছে। কই পুলিশ তো আমায় খোঁজেনি।

কৃষ্ণান: তাহলে সমস্যা কিসের?

গুণ্ডাপ্পা: পুলিশ আমাকে না খুঁজলেও কিংবা আইনের চোখে আমি অপরাধী না হলেও আমি কি সত্যিই নির্দোষ জাস্টিস কৃষ্ণান?

কৃষ্ণান: আপনি নিজেকে দোষীই বা ভাবছেন কেন প্রফেসর

গুণ্ডাপ্পা?

গুণ্ডাপ্পা: আমি দোষী নয় বলছেন?

কৃষ্ণান: না। কেন আপনার এত অপরাধবোধ প্রফেসর? আপনি কোন অপরাধ করেননি। আইনের চোখে তো নয়ই।

গুণ্ডাপ্পা: আমি কি তাকে আত্মহননে প্ররোচিত করিনি?

কৃষ্ণান: না। কী করে তা হয়? আপনি তাকে সুস্থ জীবনের কথা বলেছেন। তার অসুস্থ জীবন সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিয়েছেন। এটাতো আত্মহত্যায় প্ররোচনাদান নয়।

গুণ্ডাপ্পা: তাহলে সে আত্মঘাতী হল কেন?

কৃষ্ণান: তার অপরাধবোধ থেকে সে আত্মহত্যা করেছে। তবে এইজন্যে তাকেও দায়ী করা যায় না। সে একটা সিস্টেমের শিকার। তাই এই আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা বলাই যুক্তিসম্মত। অন্তত আমার বিচারে। দেখুন প্রফেসর। ল ইজ নাথিং বাট স্ট্রং কমন সেন্স। আমরা যেসব আইনের ভিত্তিতে বিচার করি সেসবের সীমাবদ্ধতা তো আছেই। ভবিষ্যতের মানুষ হয়তো সেইসব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবে। আপনি ওই মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী নন।

গুণ্ডাপ্পা: কিন্তু জাস্টিস কৃষ্ণান আমি তো পরোক্ষে তার মৃত্যুর কারণ হলাম। মেয়েটা তো তার অজ্ঞানতা নিয়ে ওই পথেই তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। সেই পথ ভ্রান্ত আর পঙ্কিল হলেও। আমি তো তার জীবনটা কেড়ে নিলাম চেতনার বিষ পান করিয়ে। একটা সরল সুন্দর মেয়ে। কি অপরূপ তার স্নিগ্ধ অনাবিল দৃষ্টি। সারল্যে ভরপুর। মমতায় পূর্ণ। সভ্যতার মাপকাঠি যে জানত না। ভয়ানক সরল চিত্তে যে প্রথাকে অনুসরণ করত। যার মধ্যে কোন অপরাধবোধ ছিল না। পাপবোধ ছিল না। আমি তো তার জীবনটাকে কেড়ে নিলাম জাস্টিস কৃষ্ণান। কি অপূর্ব সুধায় ভরা তার কণ্ঠ। তার গানেতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। শিক্ষায় বঞ্চিত এক নিপীড়িত মেয়ে। প্রথার শিকার হয়ে সভ্যতার বিচারে কদর্য ঐ জীবন সে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল কিছু না বুঝেই। তবুও তো তার

বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। আমি তো তার সেই অধিকার হরণ করলাম। হারিয়ে গেল একটা সরল সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবী থেকে। ঝরে গেল একটা কুড়ি। আমারই অপরাধে। হ্যাঁ জাস্টিস কৃষ্ণান। আইন আমাকে অভিযুক্ত না করলেও আমিই হত্যা করেছি ঐ ফুলের মতো মেয়েটাকে। (আর্তনাদ করে)

কৃষ্ণান: প্রফেসর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি ওভার রিয়্যাক্ট করছেন। আপনি চিৎকার করে কাঁদছেন। ইউ আর গেটিং সিলি। গেট কুল প্লিজ।

গুণ্ডাপ্পা: ও জাস্টিস কৃষ্ণান। আই এম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ। কিন্তু আমি যে এক গভীর অপরাধবোধে ভেতরে ভেতরে চুরমার হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমি ভুলতে পারছিনা মেয়েটার অসহায় বাবা মা আর ভাইয়ের বুকফাটা কান্না। যত ভুলই তারা করে থাকুক। আমি তো মেনে নিতে পারছি না তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমারই ভুলে। (কান্নায় ভেঙে পড়ে) আই এম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ। কিন্তু আমি তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনা জাস্টিস কৃষ্ণান। কেন চেতনার বিষপান করালাম ওই অবোধ সরল গ্রাম্য মেয়েটিকে।

কৃষ্ণান: না প্রফেসর। চেতনা কখনো বিষ হতে পারে না। তার মৃত্যুর জন্যে সত্যিই আপনি দায়ী নন। তার মৃত্যু একটা প্রতিবাদ। যুগ-যুগান্তরের কদর্য সামন্ততান্ত্রিক প্রথার আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। যে প্রথার, যে সমাজব্যবস্থার শিকার ওই মেয়েটি। তার মৃত্যু ঐ ব্যবস্থার মৃত্যুর পূর্বাভাস। ওই ব্যবস্থার কফিনে একটা পেরেক। আপনি আপসেট। আপনি বাড়ী যান প্রফেসর।

।।যবনিকা।।

(কন্নড় কাহিনী অনুপ্রাণিত)

(অভিনয়ের অনুমতির জন্য যোগাযোগঃ 8910019589)

সূচিপত্র

স্মরণে প্রবীর, মননে প্রবীর

লিখেছেন - মণীশ রায়চৌধুরী



প্রবীর ঘোষ, নামটা শুনলেই দুই বাংলার যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত নস্টালজিয়া কাজ করে। কারণ গত শতকের নয়ের দশক থেকে শুরু করে যারাই বাংলাভাষায় কুসংস্কার বিরোধী বইপত্রের চর্চা করেছে তাদের মধ্যে অন্তত একটা 'অলৌকিক নয় লৌকিক' বা 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা' পড়েনি এমন মানুষ বিরল।

প্রবীর ঘোষ ১৯৪৫ সালের ১ মার্চ অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা প্রভাত চন্দ্র ঘোষ ছিলেন রেল কর্মচারী। বাবার বদলির চাকরি, ফলে ছোটবেলায় কোন এলাকায় থিতু হয়ে বসা হয়নি তার। পুরুলিয়ার আদ্রায় তার বাল্যকাল কেটেছিল। তারপর তারা দমদমে চলে আসেন। সেখানেই তিনি স্কুল এবং পরে কমার্স নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা থেকে বক্সিং বিবিধ বিষয়ে তিনি চর্চা করতেন। এরপর স্টেট ব্যাঙ্কে তার কর্মজীবন এবং তার কয়েকবছরের মধ্যেই বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সীমা ঘটকের সাথে তার সংসারজীবন শুরু হয়।

এর পাশাপাশি একটা গঠন প্রক্রিয়া কিন্তু প্রছন্নভাবে চলছিল। বাল্যকাল থেকেই প্রবীর পথের মাদারিদের থেকে হাত

সাফাইয়ের কলাকৌশল শিখেছিলেন এবং তার আত্মজীবনী অনুসারে এই জ্ঞানই পরে তাকে বহু তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার রহস্যভেদ করতে সাহায্য করে। তার মতে এমন সামান্য উপকরণ দিয়ে এমন অসাধারণ জাদু কৌশল তিনি আর কোথাও দেখেননি। তার এক বিচিত্র দুষ্টুমি ছিল। তিনি যে অলৌকিক ক্ষমতাধর বাবাজিরই সন্ধান পেতেন তার কাছেই দীক্ষা নিয়ে তার বীজমন্ত্রটি জেনে নিতেন। কথিত আছে, প্রকৃত গুরু কানে বীজমন্ত্র দিতে গেলেই শিষ্য আগে কারও কাছে দীক্ষা নিয়েছে কিনা বুঝতে পারবে। অথচ, তিনি দেখলেন সকল গুরুই তাকে নির্দ্বিধায় নিজের বীজমন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত করত। এইসকল অভিজ্ঞতা তাকে যুক্তিবাদের পথে চালিত করে।

গত শতকের আটের দশকে 'পরিবর্তন', 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় প্রবীর ঘোষের কুসংস্কার বিরোধী লেখা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। স্ত্রী এবং শিশুপুত্র পিনাকী, মাত্র তিনজনের এই টিম নিয়ে তিনি শুরু করলেন অলৌকিকের রহস্যভেদকারী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম 'অলৌকিক নয় লৌকিক' যা আজ একটা ব্র্যান্ড। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে দমদমের ছোট্ট ফ্ল্যাটে গড়ে তুললেন তার স্বপ্নের সংগঠন 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' যা আজ মহীরুহতে পরিণত হয়েছে। প্রকাশিত হল তার প্রথম বই 'অলৌকিক নয় লৌকিক' এর প্রথম খন্ড, যা প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন দিক উন্মোচন করল। আরও আরও বেশি মানুষ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করলেন। এরপর একের পর এক প্রকাশিত হল 'অলৌকিক নয় লৌকিক' (২,৩,৪,৫), 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা', 'ধর্ম সেবা সম্মোহন', 'সংস্কৃতি: সংঘর্ষ ও নির্মাণ', 'জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক'। তার ইংরেজি বইয়ের অন্যতম 'Paranormal Exposed', 'The mystery of Mother Teresa and Sainthood', 'Why I do not believe in God'। অস্ট্রেলিয়া থেকে রিচার্ড ডকিন্স, জেমস র‍্যান্ডি সহ পৃথিবীর ৫০ জন বিখ্যাত নাস্তিকদের লেখার

সংকলন '50 Voices of Disbelief' প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিলেন প্রবীর ঘোষ। মৃত্যুকালে তার মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০।

বইলেখার পাশাপাশি চলছিল মাঠে নেমে তথাকথিত বাবাজি, মাতাজি, পীর ফকির, ওঝা, গুণিন, জ্যোতিষীদের ভান্ডাফোড়। এসবপ্রতারকদের মোকাবিলায় তিনি ঘোষণা করেন যে পৃথিবীর কেউ যদি কোনপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শন করতে পারেন তাহলে তিনি ৫০ হাজার টাকা প্রণামী দিয়ে সমিতির কাজকর্ম বন্ধ করে দেবেন কারণ পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছুই হয়না। তার মৃত্যুকালে সেই ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জমানি বাড়তে বাড়তে ৫০ লাখ হয়েছিল এবং তা উইকিপিডিয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। বলাইবাহুল্য এত বছরেও কেউ এই চ্যালেঞ্জ জিততে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবেনা।

আঘাত করলে প্রত্যাঘাত আসবে এটাই স্বাভাবিক। প্রবীর ঘোষের আন্দোলন যাদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত করেছিল তারাই যুক্তিবাদী সমিতিকে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। ফলত, ১৮ আগস্ট ১৯৯৬ সালে তাকেই সমিতি থেকে বহিষ্কার করার নোংরা ষড়যন্ত্র হয়। যে মানুষটা অনেকের কাছে সুপারহিরো হয়ে উঠেছিল তারই নামে জালিয়াতি, লাম্পট্য সহ নোংরা অভিযোগ শুনে বহু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ব্যথিত হয়ে বসে যান। যুক্তিবাদের ইতিহাসে এই ক্ষতি সীমাহীন। এই ষড়যন্ত্রের কিছু প্রেক্ষাপট ছিল বলে মনে করি। প্রবীরদা বলতেন কোন বড় খেলোয়াড় প্রথমেই নিজের সব তাস দেখিয়ে দেয়না। প্রবীরদাও প্রথমে অলৌকিকতার বিরোধিতা করে শুরু করেছিলেন। এরপর তা জনপ্রিয় হতেই তিনি জ্যোতিষের বিরুদ্ধে এবং নিরীশ্বরবাদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তার নিরপেক্ষতা এবং প্রগতিশীলতার মুখোশ রক্ষা করতে তাকে প্রচার প্রসার দিচ্ছিল। কিন্তু এরপরে 'ধর্ম-সেবা-সম্মোহন' বইতে তিনি লিখলেন "সেবা দ্বারা সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়"। তিনি সেবার ব্যবসা করা ফান্ডেড

এনজিও-র বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তার অন্যতম সেরা বই যাকে আমরা যুক্তিবাদী সমিতির ম্যানিফেস্টো বলে থাকি সেই 'সংস্কৃতি সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইতে তিনি লিখলেন শোষণ কাঠামোর কথা, তার লেখায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে মানবাধিকার হরণ ইত্যাদি জরুরি বিষয় উঠে এল। ফলে এতদিন তাকে প্রচার দেওয়া রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই তার উপর খড়্গহস্ত হল। তারপরে তারই কাছের মানুষদের লোভ দেখিয়ে একে একে ষড়যন্ত্রে সামিল করা হল। যদিও আদালতের রায়ে জয়ী হয়ে তিনিই সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। কিন্তু বিরোধীপক্ষ এখনো "প্রবীর ঘোষ লম্পট, ১৯৯৬ সালেই বহিষ্কৃত" এই হাস্যকর মিথ্যাচার সর্বত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

তার হাতে পরাজিত ক্ষমতাধরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খৃষ্টান দুনিয়ায় জনপ্রিয় মরিস সেরুলো, রেইকি মাস্টার ক্লাইভ হ্যারিস, ফেইথ হিলার পি গ্যালার্ডো, বাংলাদেশের বিখ্যাত ধর্মগুরু হুজুর সাইদাবাদী, ফকিরবাড়ির এস.পি. আলি, মহারাষ্ট্রের মিঠাইবাবা, কোটিপতি জ্যোতিষী আচার্য সত্যানন্দ এবং আরও অনেকে। মনিকা বেসরার টিউমার সারার দাবি করে পোপ মাদার টেরেসাকে সেন্টহুড দেওয়ার যে অপচেষ্টা করেন সেটা বন্ধ করতে পারাই সম্ভবত তার সবচেয়ে বড় অলৌকিকতা বিরোধী অবদান। বাবা রামদেবের সাথে তার লাইভ ডিবেট জনমানসে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। NDTV Imagine আয়োজিত অনুষ্ঠান 'রাজ পিছলে জনম কা' বন্ধ করতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। পশ্চিমবঙ্গে তিনি জ্যোতিষীদের প্রফেশনাল ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়েছিলেন। নয়ের দশকে রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত ধর্ম মহাসম্মেলনে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় রাষ্ট্রপতির অংশগ্রহণ আটকাতে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেকেই জানেনা নয়ের দশকে প্রবীর ঘোষ এবং সুমিত্রা পদ্মনাভনের নেতৃত্বে সমিতির উইং হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে যে আন্দোলন হয় তারই ফলশ্রুতিতে ভারতে প্রথম আইনি

ভাবে ধর্ম কলামে 'মানবতা' বা 'হিউম্যানিজম' লেখা শুরু হয় যা পত্রপত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছিল। UGC স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্যোতিষচর্চা পড়ানোর যে অপচেষ্টা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী করেছিলেন তার প্রতিবাদেও প্রবীর ঘোষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রবীর ঘোষ তার জীবনে যে অগণিত অলৌকিকতার দাবিদারদের সম্মুখীন হন তার মাত্র কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে তার জনপ্রিয় বই 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (অখণ্ড)'। তার কর্মজীবন নিয়ে বহু দেশি, বিদেশি মিডিয়া গুরুত্ব সহকারে সংবাদ প্রকাশিত করেছে, ডকুমেন্টারি বানিয়েছে যার অন্যতম হল গুরুবাস্টার্স।

প্রবীর ঘোষের বিরোধী শিবির একটা প্রশ্ন করে থাকে যে বাংলায় যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, নাস্তিকতার প্রসারে আরও বহু স্মরণীয় ব্যক্তি থাকলেও আমরা প্রবীর ঘোষ কে যে গুরুত্ব দিয়ে থাকি তা গুরুবাদী ব্যক্তিপূজার নামান্তর।

আমরা মনে করি ব্যক্তিপূজা যুক্তিবাদের শত্রু, কিন্তু শ্রদ্ধেয় কে শ্রদ্ধা এবং অতিশ্রদ্ধেয়কে অতিশ্রদ্ধা কোনভাবেই দোষ নয়। এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ সাহু সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নির্মোহ দৃষ্টিতে কিছু কথা বলতে চাই। প্রবীর ঘোষের নামে অনেকে কুৎসা করে যে তিনি এদের বই থেকে টুকে বই লিখেছেন। কিন্তু যতদূর জানি এদের সবার বইয়ের মোট সংখ্যার থেকে প্রবীর ঘোষের বইয়ের সংখ্যা বেশি, ফলে টুকে লেখার হাস্যকর অভিযোগ পাটিগণিতের হিসেবেই বাতিল হয়ে যায়। শুধু বইয়ের সংখ্যা নয় তার গুণগত মান এবং বিষয়বস্তুও এখানে জরুরি বিবেচ্য বিষয়। এইসব বরেণ্য লেখকের বই অবশ্যই বস্তুবাদ কে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসব বই শিক্ষিত সমাজের তাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চা ও বিশ্লেষণের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রবীরদার বই সহজসরল ভাষায় মাটির কাছের মানুষকে যুক্তিবাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এছাড়া তার কর্মকাণ্ড বইয়ের

বাইরে মাঠে ময়দানে অলৌকিক নয় লৌকিক কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদের বীজ বপন করে। তিনি সরাসরি অলৌকিকতার দাবিদারদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতেন, ভান্ডাফোড় করতেন। এই হি-ম্যান ইমেজ তাকে অন্যদের তুলনায় বহু যোজন এগিয়ে দেয়।

প্রবীরদার পূর্বসুরীদের ভিতর ডা: কোভুর এভাবে চ্যালেঞ্জ করতেন। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা ছিল তিনি অন্ধবিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষকেই দায়ী মনে করে দোষারোপ করতেন। মানুষকে অন্ধবিশ্বাসী রেখে দেওয়ার পেছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেননি। প্রবীরদার সাথে বাকি বিজ্ঞানকর্মীদের আরও একটা প্রধান পার্থক্য হল অলৌকিকতার ভান্ডাফোড় বা নাস্তিকতার প্রচারকেই তিনি কোন বিজ্ঞান সংগঠনের একমাত্র কাজ মনে করতেন না। তাই অন্যান্য ব্যক্তি বা সংগঠন যেখানে কুসংস্কার মুক্তি বা জনগণকে টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র চেনানো অথবা বিশেষ চশমা দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখানোকেই নিজেদের কর্তব্য মনে করত সেখানে তার চিন্তা ছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিষয়ে তিনি তার 'সংস্কৃতি: সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইতেই জরুরি কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। পরবর্তী বইগুলোতে আরও বেশি করে প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামের কথা উঠে আসতে লাগল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, মানবাধিকার তথা গণতন্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনা তার লেখায় উঠে আসতে লাগল। 'রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট', 'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস', 'গেরিলা যুদ্ধের এ টু জেড থেকে আজাদি', 'স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা' প্রভৃতি বইতে তার রাজনৈতিক চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। আর কোন বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা স্টেট ব্যাঙ্কের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভাবছে, আদিবাসীদের উপর কর্পোরেট স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হলে প্রতিবাদ করছে এমন উদাহরণ আমার অন্তত জানা নেই। অর্থাৎ বিজ্ঞান আন্দোলনকে তিনি একটা পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা রাজনৈতিক শ্রেণীসচেতনতা সৃষ্টি করে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার মনে করতেন। তিনি একটা

শোষণ বঞ্চনামুক্ত সাম্যবাদী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন এবং যুক্তিবাদ ছিল তার হাতিয়ার।

অনেকে বলেন, রক্তের জোর কমলেই মনে ঈশ্বর বিশ্বাস আসবে, অধ্যাত্ববাদী চিন্তা প্রভাব ফেলবে। কিন্তু প্রবীর ঘোষ এমন এক ঋজু মেরুদণ্ডর বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি মৃত্যুশয্যায় তার অন্তিম বার্তাতেও বলে গিয়েছেন ঈশ্বর সর্বকালের সেরা গুজব। মানুষ মারা যায়, কিন্তু যুক্তিবাদী সমিতির কাজ থামবেনা অলৌকিকতা বিরোধী অভিযান চলছে চলবে।

সকল মুক্তমনা বন্ধুদের অনুরোধ যেখানেই তথাকথিত অলৌকিকতার গল্প শুনবেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা প্রমাণ করে দেব পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কখনো কোথাও কিছু ছিলনা, থাকবেওনা।

যোগাযোগ করুন:- bigyanoyuktibadisamiti@gmail.com

মণীশ রায়চৌধুরী:- ৮১০০৮১৪১৮০

সন্তোষ শর্মা:- ৯৩৩০৪৫১৯৭৭

মধুসূদন মাহাতো:- ৯৬৩৫৮৬৬৬১৭

দেবরাজ দাস:- ৯০০৭৬৬১০০৭

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“শোষক শ্রেণী কখনই চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে।”

-প্রবীর ঘোষ

কবিতা:

সূচিপত্র

নিশিগন্ধারা আজ আর ফুল হয়ে ফোটে না

লিখেছেন – তরুন মান্না



নিশিগন্ধারা এখনও রাত জাগে দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে
দুই বাহুমূলে সময়ের ব্যবধানে জেগে ওঠে অসময়ের কুসুম।
ছিন্নভিন্ন হয় কোমল পেলব কিশোরী শরীর
শরীরী স্বপ্নগুলো বাংময় হয়ে ওঠে বেদনার আভাস ভুলে।
নিশিগন্ধারা এখনও রাত জাগে বাহুমূলে বেদনার স্বপ্ন নিয়ে।

অচেনা প্রভাত প্রশ্ন করে কিশোরীর কৌমার্যকে।
সমাজ তখন মশগুল চরিত্রের ঠাস বুনন পরিপাটি করতে,
তাতে সমাজ বাঁচলেও স্বপ্ন বাঁচে না।
মৃতের স্তুপ পেরিয়ে সদ্যজাত শিশুর টঙ্কার অনুরণিত হয়
সমাজের দ্বারে দ্বারে,
স্বপ্ন ভাঙলেও জীবন মরে না।

সেদিনের শিশু, যে জন্ম নিয়েছিল নোংরা নালির কীট হিসেবে
সময়ের আহ্বানে খোলস ছেড়ে সে আজ পূর্ণযৌবনা।
রাত জাগার আর রাত ভাঙ্গার খেলায় দক্ষতা তার জন্মগত
দুই হাতের পেলব বাঁধনে ভেঙ্গে চলে দিন বদলের স্বপ্ন।

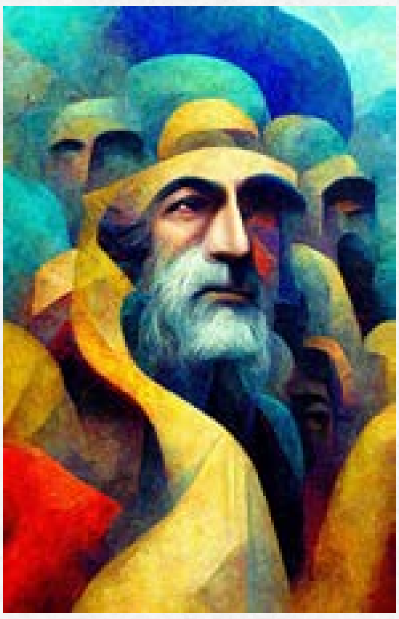
নিশিগন্ধারা, এখন আর রাত জাগে না ভালোবাসার বাসর বুনে,
আবেশের মোহে বিবেকের কীট আজ জর্জরিত।
সময়ের ডাকে আবার জাগে ভোর আবার ফোটে ফুল।
নিশিগন্ধারা কেবল হারিয়ে যায় বাঁধনের ঘেরাটোপে।

নিশিগন্ধারা আর ফুল হয়ে ফোটে না,
তারা হারিয়ে যায়, তাদের হারিয়ে যেতে হয়
সমাজের যুক্তিহীন বাঁধনের বেড়াজালে।

সূচিপত্র

পার্থনা

লিখেছেন - অশোক চার্বাক দাস



হা ঈশ্বর!
তোমার কান্না শুনে
আমার করুনা হয়,
আর সবশেষে
ঘৃণা জাগে মনে।
আমার সন্তান যখন
চলে গেল অকালে অবেলায়,
তখন আমি তোমারই মতন
বুক ভাসিয়েছিলাম চোখের জলে।
এখনও জ্বলে বুক প্রতি পলে,
প্রতি অনুপলে।
গীতা কোরান গুরুবানী
সমব্যাথী সান্তনা
পারেনি নেভাতে সেই
দুঃসহ যাতনা।
প্রতিকার না পেয়ে
ছুটে গেলাম তোমার অঙ্গনে

শান্তির সন্ধানে।
গিয়ে দেখি তুমিও কাঁদছো
মরা ছেলে কোলে নিয়ে!
তোমার শত সন্তান যখন
খুন হলো ফরাসী প্রাঙ্গনে,
তখন তোমার বেদনা যে কত
সেটা আমি জানি।
আর জানে পুত্রহারা
দুঃখী যত পিতা
যারা কাঁদে পৃথিবীর
কোনায় কোনায়।
খুন হয় গোধরায়
বোম্বাই প্যারিসে
হাহাকার শোনা যায়
আকাশে ও বাতাসে।

তোমার ভক্তরা সব
পায়ে দলে তোমারই শোনিত
যেটা তোমার দেহ থেকে
বয়েছিল বিধর্মীরও বুকে।
একইভাবে চার্বাক
পুড়েছিল ব্রাহ্মণের আগুনে
মানবধর্ম প্রচার করা
ছিল তার অপরাধ।

পবিত্র ক্রুসেডেও মারা গেছে

কত কোটি কে বা জানে,
পানেসার দাভোলকার
বলি হয় জনে জনে, মসজিদ ভেঙে পড়ে
মন্দির পোড়ে,
রুধিরের ধারা বয়
অধর্মীর দোরে।

এইভাবে বয়ে চলে
বিকৃতির ট্র্যাডিশন
পাপী পায় স্বর্গ
খুনী পায় সম্মান।
বোঝেনাকো ওরা সব
গুলি খাওয়া মানুমানুষেরা
তোমারই সৃষ্টি,
তারা তোমারই ঔরসে নিয়েছে জনম ধার্মিকের সাথে,
তোমারই রক্ত বয়ে যায়
বিধর্মীর শিরায় শিরায়। কাপুরুষ তারা, ধর্মহীন,
মানবধর্ম পায়ে দলে
তারা শুধু কাঁদায় ঈস্বরে,
আর কাঁদি আমি
পুত্রশোকাতুর শতপিতা সাথে।
হা ঈশ্বর!
তুমি নাকি করুনাময়, সর্বশক্তিমান?
তবে কেন দাও ভার
জহ্লাদের ওপর
বাঁচাতে তোমার প্রাণ

তোমার ধন, তোমার মান?

তোমার অস্তিত্ব কি
এতই বিপন্ন প্রভু
সম্মান তোমার এতই ঠুনকো,
সামান্য বিধর্মী পারে কেড়ে নিতে
তোমার প্রাণ, তোমার মান?
আর স্বর্গলোভী খুনী পারে
তোমাকে বাঁচাতে?
পিতা তুমি – বিশ্বপিতা,
পিতা তুমি সমস্ত জীবের
পিতা তুমি ধার্মিকের
পিতা তুমি অধার্মিকের,
ভিন্ন পথে যেতে চায় যারা
তোমার আশ্রয়ে,
তারাও তোমারই সন্তান,
জন্মেছে তোমারই ঔরসে
তোমারই রক্তমাংসে, বেড়েছে তোমার কোলে
পুষ্ট তোমারই জলে
হয়ত তোমারই ভুলে।

সাধুগণ বলে
তোমার বিচার শুনে
তোমারই আদেশ মেনে
তোমার ভক্ত ছেলে
গুলি মারে অধর্মা সন্তানে।
কোলে তুলে নাও তুমি

যারা খুন করে তোমার আত্মজে
যারা কেড়ে নেয়
তোমার নিকট থেকে বিচারের অধিকার,
বসে তারা তোমার আসনে।
বর দাও তাহাদেরই
স্বর্গনারী পুরস্কার।
তোমার নীরবতা দেখে
মনে হয় কান্না তোমার
মিথ্যা মায়া,
পুত্রশোক ছলনা মাত্র।

মনে হয় নিশ্চিন্ত হয়েছ তুমি
তোমার অবাধ্য সন্তান হয়েছে নিশ্চিহ্ন,
সুরক্ষিত হইয়েছে তোমার অস্তিত্ব
সন্তান রক্তের বিনিময়ে।
অবাক হয়ে দেখি আমি
যখন আপন সন্তানের
রক্তমাখা প্রাণহীন দেহ
লুটায় রাস্তায়,
মিটিমিটি হাস তুমি
দেবালয়ের সিংহাসনে বসে
আয়েসে সন্তোষে।

অনেক হয়েছে পিতা
ওগো বিশ্বপিতা!
চাইনা তোমাকে আর,

কলুষিত হাত তোমার
সন্তানের রক্ত মেখে।
খুনী তুমি,
জিঘাংসা আছে তোমার মনে,
হৃদয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা।
নির্দয় তুমি, অক্ষম তুমি,
কাপুরুষ –
পারোনাকো পুত্রহত্যা থামাতে,
খুনীর সাহায্য ছাড়া
নিজ প্রাণ, নিজ মান বাঁচাতে।
চলে যাও তুমি
ওগো দয়াময়,
চলে যাও এই গ্রহ থেকে,
ধার্মিকের বিষমন থেকে।
তোমাকে ছাড়া চলবে জীবন
যেমন চলতো পৃথিবীটা তোমার জন্মের আগে।

পৃথিবীতে ফিরে আসুক
দাঙ্গাহীন, হিংসাহীন
ধর্মহীন ঈশ্বরহীন পৃথিবীর স্বর্গ – সেই আগেকার মত।

[প্যারিসের পবিত্র গণহত্যার পর]

সানফ্র্যান্সিস্কো,

২৫/১১/২০১৫

[প্রথম প্রকাশ ‘শায়ক শারদীয় সংখ্যা ২০১৬]

সূচিপত্র

ইটস্ মুভ

লিখেছেন – তারক নাথ সাহা



জ্ঞানীদের জ্ঞান হবার জন্য,
অনুশোচনা করতে হয় বরাবরই;
প্রভু যীশুর জন্মের,
অনেক আগে থেকেই।

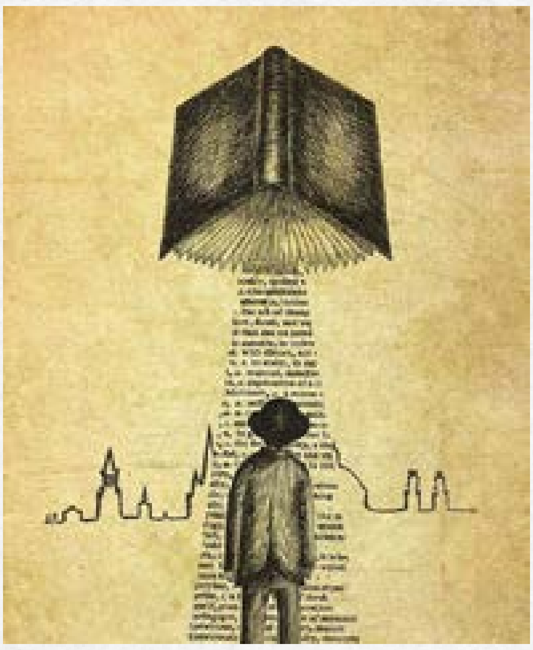
"পৃথিবীটা ঘুরছে" মানতে পারেনি বলে,
হেমলকে আবিষ্ট গ্যালিলিও;
শেষ শব্দ তরঙ্গ ছড়িয়ে গেলেন,
"ইটস্ মুভ"।

সত্যের গলা টিপে ধরবার,
ঐতিহ্যময় বর্বরতা;
আজও বিশ্বাস দিয়ে ,
বিজ্ঞানকে দাবিয়ে রাখার খেলায় মত্ত।
আই এ এস, আই পি এস,
কিংবা পি এইচ ডি দের;
আজও পদলেহন করে চলতে হয়,
নীতিহীন মূর্খ মন্ত্রীবাহিনীর

সূচিপত্র

প্রবীর ঘোষ

লিখেছেন – বিপ্লব সেন



চলে গেলেন সমিতির প্রাণ পুরুষ
জীবন অস্তমিত,
শুন্যতার হাহাকার বুকের মাঝে
হৃদয়ে কান্না অবিরত।

মানুষ হয়তো মরণশীল
চলে যেতে হবে একদিন,
আপনার চিন্তাধারা মোদের চেতনায়
থাকবে অমলিন।

তাই আলোর পথের পথিক হয়ে
এগোনো আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে,
আপনার স্বপ্ন আমাদের বুকে
আপনার জাগ্রত চেতনার চক্ষে।

একজন বন্ধুর মৃত্যু পাথরের চেয়ে ভারী
এটা করি অনুভব,

আজও “সংঘর্ষ ও নির্মাণ” চেতনায়
মুক্তির কলরব।

আপনি ঘুমান কমরেড
জেগে আছি মোরা অতন্দ্র পাহারায়,
প্রবীর বাবু “লাল সেলাম”
আজ ক্ষতবিক্ষত ভারাক্রান্ত মোর হৃদয়।

চেতনায় আপনি থাকবেন বেঁচে
থাকবে মুক্তির চিন্তাধারা,
তরণী বেয়ে এগিয়ে চলি
আজ কে মোরা পিতৃ হারা।

অলৌকিকতার থেকে উত্তরণ
চেতনার লৌকিকতায়,
আজও প্রবীর বাবু আপনি
জেগে আছেন মোর চেতনায়।

সূচিপত্র

রাষ্ট্রের ধর্ম

লিখেছেন – রামকৃষ্ণ সাহা



যত তুমি ধর্ম খাবে,
শাসক তত নিরাপদে।
হ্যাঁ, যত তুমি ধর্ম খাবে,
শাসক তত নিরাপদে।
তোমার হাতে অস্ত্র রবে,
রক্ত নেশায় পাগল হবে।
প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়ে,
আনুগত্যের শরিক হবে।
যত তুমি ধর্ম খাবে,
শাসক তত নিরাপদে।

গ্যাসের দাম বাড়লে পরে
মুচকি হেসে মেনে নেবে।
তেলের দাম? আলু থেকে ওল?
বলবে তখন– “আমার ভাগ্যে গন্ডগোল”।

তুমি যখন ধর্ম নেশায় আনুগত্যে দিচ্ছ শান,
ঐ দিকে তে মুচকি হেসে শাসক বলছে–
“বাড়াও এবার ওষুধের দাম”।
কেউ যদি ট্যাঁ ফোঁ করো,
ছুঁড়ে দাও প্রশ্ন।
ছেড়ে দিয়ে মিডিয়া,
বোঝাবে শঙ্কটে মোর ধর্ম।

হরি হরি, কেটে নিয়ে জিভ,
শুরু হবে হুক্কা হুয়া।
ফুলবে তোমার গলার শিরা,
তারপর তে মাসলে চাপড়।
সম্প্রদায়ে হানাহানি।
খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি।
ক্লান্তি যখন আসবে ধেয়ে,
দেখবে তখন তুমি চেয়ে–
লুট হয়েছে হাজার কোটি
ভাই ভাইপো কোটিপতি।
নীরবে পালায় নীরব মোদী,
তুমি আমি বাজাই থালা, মুষ্টিমেয় কোটিপতি।

চলো তাহলে আর একদান?
ভক্তি ভরে ধর্ম খেলি।

সূচিপত্র

হুজুরের গোলাম

লিখেছেন – প্রিন্সি বেরা



এককলম সই করে সেজে বসে নেতা
আসলে যে হুজুরের গোলাম,
দুটো টাকা পেলেই দেখাবো কেতা।
বুঝিনা সংসারের রীতিনীতি
বুঝবো কি করে রাজনীতি ?

দিয়েছো সিংহাসন,সাজিয়েছো সঙ
দেখাবো ঢঙ ! চালাবো শুধু কলম
কাজের কাজ তোমরাও করোনা,আমিও করিনা
দিয়ে যায় বাতেলা।

পাবলিক অভিযোগ চাপিয়ে দেবো
তাদেরই কোনো দাদা ভাইয়ের উপর
কেস টা চাপা পড়বে।
পার্টি মিথ্যে ঘটনা সাজাবে।
নাটক দেখিয়ে মিডিয়াকে বোঝাবে।

আমি নিচুতলার এক্টিভ সদস্য,
দারুন আমার মানুষের প্রতি প্রেম।
তোমরা শুধু ভুল বোঝো,ভাবছো আমি খেলছি গেম!

কানে কানে বলি তবে শোনো;
করোনা পাঁচকান!
একদিন হয়েছিলাম নিলাম,
এখন বিক্রিত ফসল,
মোদ্দাকথা,আমিও ভক্ত তুমিও ভক্ত
আমরা সবাই গ্যালারিতে বসা দর্শক
আসল খেলা খেলছে আসলে
উপর তলার শাসক।

ধন্যবাদান্তে

রমা বেরা, উস্থি

সূচিপত্র

দূষণে প্রকৃতির সর্বনাশ

লিখেছেন – বিপ্লব সেন



সুসভ্য নগর সভ্যতায় গড়া
সু উচ্চ অট্টালিকা,
হৃদয়ের শব্দ যায় না শোনা
চেতনা হয়েছে ফাঁকা।

লক্ষ্ কোটি বৃক্ষের ওই
মৃত্যুর ঠিকানা লেখা,
ভেবে দেখুন চলেছি কোথায়
প্রয়োজন কি শুধুই টাকা?

টাকার বিনিময় যায় না
ফেরানো প্রকৃতির চরম ক্ষতি,
ভেবে দেখুন উষ্ণতার পারা কোথায় যায়
এটা মূর্খামির বেসাতি।

প্রচুর শক্তি প্রচুর মারণাস্ত্র দারুন উন্নত,
ভোরের বেলা পাখির ডাক
সেটা আজ পরাভূত।

উদার আকাশে মুক্ত খেচর মেলে দিত তার ডানা,
দূষণের ভারে হারিয়ে গেছে
তার মুক্তির ঠিকানা।

কত জঙ্গন তার মধ্যে
ছিল পশুর বিচরণ,
আজকে তারা বিলুপ্ত প্রায় আছে অনেক উদাহরণ।

কল কারখানার কালো ধোঁয়া
বিষাক্ত আকাশ বাতাস,
তার ই মাঝে শুনতে পাওয়া
সভ্যতার হা হুতাশ।

এই কি সেই উন্নত সভ্যতা
এটাই কি আগামীর পৃথিবী?
বর্তমানের কাছে ভবিষ্যতের শিশুর
আছে কিন্তু দাবি।

রবি ঠাকুরের উদাত্ত আহ্বান আজও মনেতে বাজে,
"দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এই নগর",
সভ্যতা মুখ লুকিয়ে ফেলে "লাজে।"

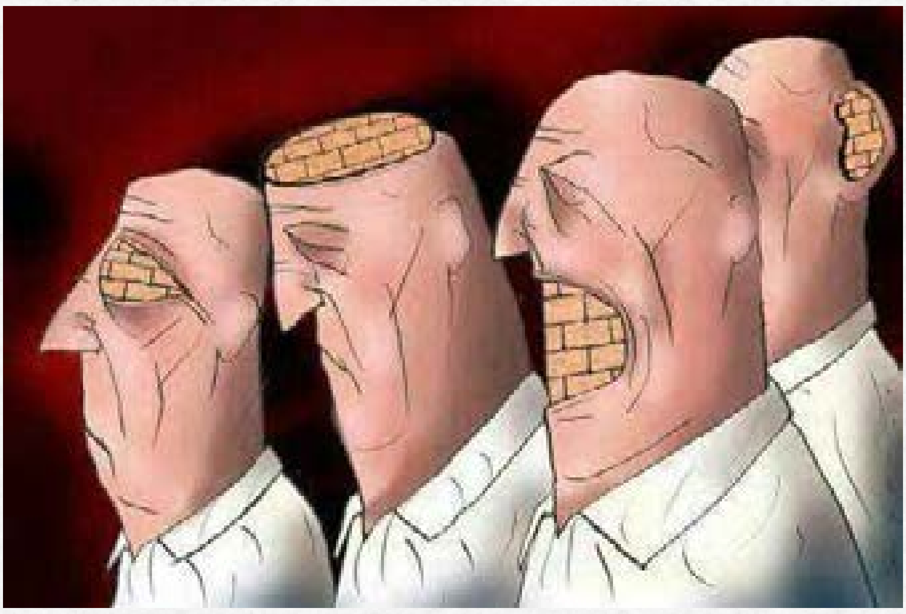
বিকৃত বিকাশ সভ্যতার সংকট দারুন ঘনীভূত,
ওহে উন্নত মানব সভ্যতা
শেষের সে দিন দ্রুত আগত।

কান পেতে শোনো বিনাশের ঘণ্টা এখনও আছে সময়,
বদলে ফেলা নচেৎ প্রকৃতি
প্রতিশোধ নেবে নিশ্চয়।

সূচিপত্র

মন্ত্রিমশাই

লিখেছেন – তাপস কুমার সরকার



কোন দেশেতে আছি আমরা খাচ্ছি শুধু ধোঁকা
মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে ওরা আমরা কেবল বোকা
তোরা বুঝবি কবে ?

তোরা বুঝবি কবে সজাগ হ'রে বলছি দরবারে
এমন করেই ডুবিয়ে দেবে আমার রাজ্যটারে
তোদের কি বলি ভাই

তোদের কি বলি ভাই ক'দিন বাদে সামনে আবার ভোট
ব্যবসাটাকে টিকিয়ে রাখতে ডানে বামে জোট
তোরা সজাগ হ'ভাই

তোরা সজাগ হ'ভাই দেশ বাঁচাতে ভালমন্দ বোঝ
গণ্ড মূর্খ আনিস নারে তোরা শিক্ষিতদের খোঁজ
ওই সর্বনাশা

ওই সর্বনাশা সেই যে গেছে ভোট পর্ব শেষে

লুটেরা সব লুট করছে দেখলো না সে এসে
ও উকিল বাবু

ও উকিল বাবু বেজায় খুশি কেস পাবে ভুরিভুরি
শাওয়াল করবে জোর গলাতে করেনি ওরা চুরি
তুমি কোথায় যাবে?

তুমি কোথায় যাবে দুঃখ করে বলতে মনের কথা
নেতা মন্ত্রী ওরাই পন্ডিত আমরা কেবল বোকা
আছি কোন দেশেতে

আছি কোন দেশেতে বলতে পারো একটু জানতে চাই
ঘুরছি যেন অন্ধকারে আছি গোলক- ধাঁধায়
সাহেব মন্ত্রীমশাই।

সূচিপত্র

একটু আগুন চাই

লিখেছেন – সজল কান্তি টিকাদার



জাত জাত জাত করে তোরা---
চেঁচাসনেকো আর
এমনি করেই দেশটা দ্যাখ
করলিরে ছারখার।
ভারত ভাগ হলো তবু
হলনা তোদের শিক্ষা
এখনো তোরা নিচ্ছিস দেখি
বিভেদ নীতির দীক্ষা।

আমরা সবাই মানুষ;

এটা ভাবতে তোদের দ্বিধা কেন?
সবাই আমরা সমান মাপের

নইরে ছোটো নইরে হীন--

সব মানুষের সৃষ্টি যদি
করেই একজন
তবে কেন জাত পাতের
এতই আয়োজন?

পৈতে পড়লেই হয়নারে কেউ
অনেক উঁচু জাত
ছোঁয়াছুঁইই দিয়েই ভারত
করলিরে বরবাদ।

আমরা বামুন আমরা বড়ো
বলিসনেকো আর
পৈতে পড়ে কেন করিস
মিথ্যে অহংকার?

দেব দেবী পূজো ব্যবসা ওদের
আর তো কিছুই নয়
টাকা পয়সা তবু তোরা
করিস কেনো ক্ষয়।
তোদের মাথায় হাত বুলিয়ে
ধনী হচ্ছে ওরা
গরীব থেকে আরও গরীব
হচ্ছিস শুধু তোরা।
হাজার হাজার বছর ধরে

এমনি করেই ওরা
তোদের বুকে বসিয়েছে
এমন গুপ্ত ছোরা।
সমাজ বুকে এখন এবার
এমন আগুন চাই
যে আগুনে জাতপাত আর
পৈতে হবে ছাই।

সূচিপত্র

যুক্তিবাদী যোদ্ধা প্রবীর ঘোষের উদ্দেশ্যে

লি খে ছে ন – মি হি র



বয়সের ভারে শরীর ঝুকেছে,
ও চোখের চাহনি ঝোকে নি কখনো,
জীবন দিয়েছে কষ্ট অনেক,
মুখের সেই বিজয়ী হাসিটা নেভেনি কখনো।
বয়সের ভারে কোমর ভেঙেছে,
ভাঙুক কোমর নেই কো খেদ,
কিন্তু যে কোমর ভেঙেছে তান্ত্রিক' জ্যোতিষীর,
পাঁজর ভেঙে তা করেছে ভেদ।
তুমি, অমর রবে বইয়ের পাতায়,
অমর রবে শুধু নয়,
একদিন, গর্জে উঠবে বিপ্লবী হাত,
যুক্তিবাদী চেতনায়।

সূচিপত্র



দেবতার জন্ম

শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায়ই হোঁচট খাই। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কদিন ধরেই ভাবছি কি করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার তেমন কোনো তাড়া ছিল না, অন্তত ঐরূপ তীরবেগে অকস্মাৎ ধাবিত হব এমন অভিপ্রায় ছিল না আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষ আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত করে দিল যে, অন্যদিক থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসম্বরণ করতে অক্ষম হলুম কী ভাগ্যি, ড্রাইভারটা ছিলো হুঁশিয়ার—তাই রক্ষে!

সেদিন থেকেই ভাবছি কি করা যায়। আমার জীবন-পথের মাঝখানে সামান্য একটুকরো পাথর যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে কোনোদিন এরূপ কল্পনা করিনি! তাছাড়া, ক্রমশই এটা জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে উঠছে, কেননা ধাবমান মোটর চিরদিনই কিছু আমার পদলনকে মার্জনার চোখে দেখবে এমন আশা করতে পারি না।

তাই ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, হয় ও থাকুক নয় আমি ও থাকলে আমি বেশিদিন। থাকব কিনা সন্দেহস্থলা তাই যখন আমার থাকাটাই, অন্তত আমার দিক থেকে বেশি বাঞ্ছনীয়, তখন একদা প্রাতঃকালে একা কোদাল যোগাড় করে লেগে পড়তে হলো।

একটা বড় গোছের নুড়ি, ওর সামান্য অংশই রাস্তার ওপর মাথা তুলেছিলা বহু পরিশ্রমের পর। যখন ওটাকে সমূলে উৎখাত করতে পেরেছি, তখন মাথার ঘাম মুছে দেখি আমার চারিদিকে রীতিমত জনতা। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ এঁদেরই নীরব ও সরব সহানুভূতি আমার উদ্যমে উৎসাহ। সঞ্চার করছিল।

তাঁদের সকলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কেউ চান এই পাথরটা?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কারু ঔৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আবার ঘোষণা করতে হলো—যদি দরকার থাকে নিতে পারেনা অনায়াসেই নিতে পারেনা আমার শ্রম তাহলে সার্থক জ্ঞান করব এবং আমি খুশী হব।

জনতার এক তরফ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—এটা খুঁড়ছিলেন কেন? কোনো স্বপ্ন টপ্ন পেয়েছেন নাকি?

আমি লোকটার দিকে একটু তাকালাম, তারপর ঘাড় নেড়ে বললাম—না, যা ভাবছেন তা নয়। পাথরটাকে রাস্তার এক নিরাপদ কোণে স্থাপিত করা গেল। কিন্তু আমার কথায় যেন ওর প্রত্যয় হলো না, কয়েকবার আপনমনে মাথা নেড়ে সে আবার প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছেন পাননি, কোনো প্রত্যা-দেশ-টত্যাদেশ?

—কিচ্ছু না।

লোকটার কৌতূহলকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ওপরে এসে মাকে বললাম, দু'কাপ চা তৈরী করতো আমার জন্যই দু' কাপ পাথরটার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কাতর হয়ে পড়েছিলাম প্রায় প্র-স্তরীভূত হয়ে গেছলাম, বলতে কি!

এরপর প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরুতে এবং বেড়িয়ে ফিরতে নুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অনেক সময় হয় না, যখন অন্যম-নস্ক থাকি। এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করতে

পেরেছি, কেননা আমাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা ওর আর নেই। সে-দৈবশক্তি ওর লোপ পেয়েছে।

আমাদের মধ্যে একরকম হৃদ্যতা জন্মেছে এখন বলা যেতে পারে। এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম নুড়িটার কান্তি ফিরেছে, ধুলোবালি মুছে গিয়ে দিব্য চাকচিক্য দেখা দিয়েছে। যারা সকালে বিকালে হোস পাইপে রাস্তায় জল ছিটোয়, বোঝা গেল, তাদেরই কারুর স্নেহদৃষ্টি এর ওপর পড়েছিল। ওর চেহারার শ্রীবৃদ্ধি দেখে সুখী হলাম।

—ব্যাপার কিরকম বুঝচেন?

হঠাৎ পেছন থেকে প্রশ্নাহত হয়ে ফিরে তাকালাম সেদিনের সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সেই থেকে এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি? না, কোনো প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ পেলেন?

—না, তা কেন? এই পথেই আমার যাতায়াত কিনা।

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতে পারেন।

—নুড়িটা দেখছি আছে ঠিক। কেউ নেবে না—কি বলেন?

প্রশ্নটা এইভাবে করলো যেন যে-রকম দামী জিনিসটা পথে পড়ে আছে অমন আর ভূভারতে কোথাও মেলে না এবং ওর গুপ্তশত্রুর দল ওটাকে আত্মসাৎ করবার মতলবে ঘোরতর চক্রান্তে লিপ্ত ছোঁ মেরে লুফে নেবার তালে হাত বাড়িয়ে সবাই যেন লোলুপা আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম—না, না, আপনার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, সরকার বাহাদুর তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাঁচির অতিথিশালায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, তাছাড়া, আপনি নিজেই যখন এদিকে কড়া নজর রেখেছেন তখন তো চিন্তা করার কিছু দেখিনে।

সে একটু হেসে বলল—আপনার যেমন কথা! দেখেছেন এদিকে কারা ওর পূজার্চনা করে গেছে?

ভালো করে নিরীক্ষণ করি—সত্যিই, দেখিনি তো, এক বেলার মধ্যেই কারা এসে পাথরটার সর্বাঙ্গে বেশ করে তেল-

সিঁদুর লেপে দিয়ে গেছে।

আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম—ভালোই হয়েছে। এতদিনে তবু ওর কান্তি ফিরলো এবং আরেকটি সমঝদার জুটলো!

পাথরটার সমাদরে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখলাম। কপাল কুঁচকে সে বললে—সেই তো ভয়! সেই সমঝদার না ইতিমধ্যে ওটিকে সরিয়ে ফ্যালে!

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য হলাম খুব। কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের অযাচিত উদয় হলো মনে কিন্তু সঠিক সদুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার এরূপ অনুপস্থিতিতে এই পথে হরদম যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে প্রাণে বেজায় ব্যথা পাবে অনুমান করা কঠিন নয়। একথা ভেবে লোকটার জন্য একটু দুঃখই জাগলো—কিম্বা, এ সেই তত্বজিজ্ঞাসুরই কর্মযোগ?

অনেকদিন পরে গলির মোড়ের অশথতলা দিয়ে আসছি—ও হরি! এখানে নুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে! নুড়ির স্থুল অঙ্গটা গাছের গোড়ায় এমন ভাবে পুঁতেছে যে, উপরের উদ্ধৃত গোলাকার নিটোল মসৃণ অংশ দেখে শিবলিঙ্গ বলে ওকে সন্দেহ হতে পারে। এই প্রয়োগনৈপুণ্য যার, তাকে বাহাদুরি দিতে হয়। নুড়িটার চারিদিকে ফুল বেলপাতা আতপচালের ছড়াছড়ি। সকালের দিকে এই পথে যে সব পুণ্যলোভী গঙ্গাস্নানে যায়, তারাই ফেরার পথে সস্তায় পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয়ের সুবর্ণসুযোগরূপে একে গ্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক, মহাসমারোহেই ইনি এখানে বিরাজ করছেন—অতঃপর এঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারু দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।

নুড়িটার এই পদোন্নতিতে আন্তরিক খুশি হলাম আমি একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ করতে থাক—ওর গৌরব, সে তো আমারই গর্ব। পৃথিবীর বুকে ওর জন্মদাতা আমি, এইজন্য মনে মনে পিতৃত্বের একটা পুলক অনুভব না করে পারলাম না! এবং কায়মনোবাক্যে ওকে

আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে তার দেবতার সন্ধান দেব কিনা মাঝে মাঝে ভেবেছি। পথে ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে ভেবেছিলাম ও মুহ্যমান হয়ে পড়বে, কিন্তু উলটে ওকে প্রফুল্লই দেখা গেল। এত বড় একটা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন আর ওকে উতলা করে তোলায় কি লাভ।

মাঝে মাঝে অশথতলার পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরি, লক্ষ্য করি, দিনকের দিন নুড়িটার মর্যাদা। বাড়ছে। একদিন দেখলাম, গোটাকতক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়েছে, গাঁজার গন্ধ এবং ববমবম শব্দের ঠেলায় ওখান দিয়ে নাক কান বাঁচিয়ে যাওয়া দুষ্কর। ঘ্রাণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপরে দস্তুরমতই অত্যাচার।

যখন সন্ন্যাসী জুটেছে তখন ভক্ত জুটতে দেরি হবে না এবং ভক্তির আতিশয্য অনতিবিলম্বেই ইট-কাঠের মূর্তি ধরে মন্দিররূপে অভ্রভেদী হয়ে দেখা দেবো দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদী হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হয়ে দাঁড়াবে।

এর কিছুদিন পরে একটা চিনির কলের ব্যাপারে কয়েক মাসের জন্য আমাকে চম্পারণ যেতে হলো। অশথতলার পাশ দিয়ে গেলেও চলে, ভাবলাম, যাবার আগে দেবতার অবস্থাটা দেখে যাই। যা অনুমান করেছিলাম তাই, সন্ন্যাসীর সমাগমে ভক্তের সমারোহ হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে, ইনি হচ্ছেন। ত্রিলোকেশ্বর শিব, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু, একেবারে পাতাল ছুঁড়ে ফেঁপে উঠেছেন—এঁর তল নেই। অতএব এঁর উপযুক্ত সম্বর্ধনা করতে হলে এখানে একটা মন্দির খাড়া না করলে চলে না।

একবার বাসনা হলো, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস সবাইকে ডেকে বলে দিই, কিন্তু জীবন-বীমা করা ছিল না এবং ভক্তি কতটা ভয়াবহ হতে পারে জানতাম,

আর তা ছাড়া ট্রেনের বিলম্বও বেশি নেই ইত্যাদি বিবেচনা করে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটাকে খবর না দিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি, কেননা যতদূর ধারণা হয়, নুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করাই তার অভিরুচি ছিল কিন্তু ইনি যে ভক্তের তোয়াক্কা না রেখেই স্বকীয় প্রতিভাবলে এবং স্বচেষ্টায় ইতি-মধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই সংবাদে সে পুলকিত কিম্বা মর্মাহত হতো বলা কঠিন।

কয়েক মাস বাদে যখন ফিরলাম তখন অশথতলার মোড়কে আর চেনাই যায় না। ছোটখাট একটা মন্দির উঠেছে, শঙ্খ-ঘণ্টার আর্তনাদে কান পাতা দায় এবং ভক্তের ভিড় ঠেলে চলা দুরূহ। কিন্তু সে কথা বলছি না, সবচেয়ে বিস্মিত হলাম সেই সঙ্গে আরেক জনের আবির্ভাবে, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয় কলেবর পরিবর্তন পর্যন্ত দেখো মন্দিরের চত্বরে সেই লোকটা—প্রথমতম, সেই আদি ও অকৃত্রিম উপাসকগেরু-য়া, তিলক এবং রুদ্রাক্ষের চাপে তাকে আর চেনাই যায় না এখন!

—এ কি ব্যাপার?

আমিই গায়ে পড়ে প্রশ্ন করলাম একদিন।

—আজ্ঞে, এই দীনই শিবের সেবায়েত।

লোকটি বিনীত ভাবে জবাব দেয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিব্যি বিনিপুঁজির ব্যবসা ফাঁদা হয়েছে। এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত করে নজর রাখা হয়েছিল?

শিলাখণ্ডের প্রতি ওর প্রীতিশীলতা যে অহেতুক এবং একে-বারেই নিঃস্বার্থ ছিল না, এইটা জেনেই বোধ করি অকস্মাৎ ওর ওপর দারুণ রাগ হয়ে যায়, ভারি রূঢ় হয়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বলল—অমন বলবেন না। পাথর কি মশাই? শ্রীবিষ্ণু! সাক্ষাৎ দেবতা যে। ত্রিলোকেশ্বর শিব!

উদ্দেশে সে নমস্কার জানায়।

আমি হেসে ফেললাম—ওর তল নেই, না?

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—ওরাই তো বলো

—তুমি নিজে কী বলো? ওরা তো বলে নিচে যতই কেন খুঁড়ে যাও না, টিউব-কলের মত ওই শিবলিঙ্গ বরাবর নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

—কী জানি! তাই হয়তো হবে।

কতদূর শেকড় নেবেছে খুঁড়ে দেখই না কেন একদিন?

জিভ কেটে লোকটা বলল—ওসব কথা কেন, ওতে অপরাধ হয়। বাবা রাগ করবেন—উনি আমাদের জাগ্রত।

—বটে? কিরকম জাগ্রত শুনি?

—এই ধরুন না কেন! এবার তো কলকাতায় দারুণ বসন্ত, টিকে নিয়ে কিছু করেই কিছু হচ্ছে না—

—য়্যাঁ, বলো কি, মহামারী নাকি, জানতাম না তো!

—খবরের কাগজেই দেখবেন কিরকম লোক মরছে। কর্পো-রেশন থেকে টিকে দেবার ত্রুটি নেই অথচ প্রত্যেক পাড়াতেই কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কারু হয়নি দেবতার কৃপায়। আমরা কেউ টিকেও নিইনি, কেবল বাবার চন্নামেত্ত খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না হয় তবে জাগ্রত আপনি কাকে বলেন?

এবার কি জবাব দেব তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে যা কষ্ট পেয়েছিলাম এবং যা করে বেঁচে-ছিলাম তাতে বাবা ত্রিলোকনাথের মহিমা তখন আমার মাথায় উঠেছে। 'আমি এখন চললুম। আমাকে এক্ষুনি টিকে নিতে হবে আরেকদিন এসে গল্প করব।' বলে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে ধাবিত হলাম।

পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা দাঁড় করিয়ে সে বললে—আরে, কোথায় চলেছো এমন হন্যে। হয়ে?

—টিকে নিতে।

—টিকে নিয়ে তো ছাই হচ্ছে। টিকেয় কিসসু হয় না তুমি বরং দু'শ শক্তির ভেরিওলিনাম এক ডোজ খাও গে, কিং কম্পানির থেকে—যদি টিকে থাকতে চাও! পরের হপ্তায় ঐ আরেক

ডোজ, তারপরে আরেকব্যাস, নিশ্চিন্দি। টিকে ফেল করেছে আকচার দেখা যায়, কিন্তু ভেরিওলিনাম নেভার!

—বলো কি? জানতাম না তো!

—জানবে কোত্থেকে? কেবল ফোঁড়াখুঁড়ি এই তো জেনেছো! অন্য কিছুতে কি আর তোমাদের বিশ্বেস আছে? আমি হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস ধরেছি, আমি জানি

—বেশ, তাই খাচ্ছি না হয়।

কিং কম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ দু'শ শক্তির ভেরিওলিনাম গলাধঃকরণ করলাম। যাক, এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া গেল। হালকা হতে পারলাম।

এর পরেই পথ দিয়ে উপরি-উপরি কয়েকটা শবযাত্রা গেল নিশ্চয়ই এরা বসন্ত রোগেই মরেছে? কী সর্বনাশ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ লক্ষই না বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ভেরিওলিনাম রক্তে পৌঁছতে না পৌঁছতেই এতক্ষণে এই সব মারাত্মক রোগাণুর কাজ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়! হাত পা সিঁটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে—এই বিপদসংকুল বাতাসের নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত এক টুকরো প্রাচীরপত্রে বিখ্যাত বসন্ত চিকিৎসক কোন এক কবিরাজের নাম দেখলাম। হোমিওপ্যাথি করা গেছে, কবিরাজিই বা বাকি থাকে কেন—যে উপায়েই হোক সবার আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌঁছতেই দেখলাম কয়েকজন মিলে খুব ধুমধাম করে প্রকাণ্ড একটা শিলে কী যেন বাঁটছেন। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাঁটা হচ্ছে। কন্টিকারির শেকড় বেঁটে খেতে হয়। ওর মত বসন্তের অব্যর্থ প্রতিষেধক আর কিছু নেই মশাই!

ব্যবস্থামত তাই এক তাল খেয়ে রিক্সা ডেকে উঠে বসা গেল। গায়ে যেন জোর পাচ্ছিল।ম না, মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, জ্বর-জ্বর ভাব—বসন্ত হবার আগে এই রকমই নাকি হয়ে

থাকে। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাব না, মা। দেহটা ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বললেন—কী হয়েছে তোর?

—হয়নি কিছু বোধহয় হবে!...বসন্ত।

—বালাই ষাটা বলতে নেই। তা কেন হতে যাবে? এই হর্তু-কির টুকরোটা হাতে বাঁধ দিকি। আমি তিরিশ বছর বাঁধছি, এই হাতে বসন্ত রোগীই তো ঘাঁটলাম, সেবা করলাম, কিন্তু বলতে নেই, এরই জোরে কোনোদিন হাম পর্যন্ত হয়নি— নে ধর এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাগাটা খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারো হয়নি তোমার? বলো কি? দাও, দাও তবে। এতক্ষণ বলোনি কেন? কিন্তু এই একটুকরোয় কি হবে? রোগ যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাকে আস্ত একটা হর্তুকি দাও যদি তাতে আটকায়।

হর্তুকি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিকালের দিকে শরীরটা বেশ ম্যা-জম্যাজ করতে লাগলো। নিজেকে রীতিমত জ্বরজড়িত মনে হলো। আয়না নিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম, মুখেও যেন দু'একটা ফুসকুড়ির মতো দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, তবে আর বাঁচন নেই, মাকে ডেকে দেখালামা

মা বললেন—মার অনুগ্রহ—নয় ব্রণ।

আমি বললাম—উঁহু। ব্রণ নয়, নিতান্তই মার অনুগ্রহ!

মা বললেন—অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস নো ও কিছু না, সমস্ত দিন ঘরে বসে আছিস, একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় গে।

এরকম দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে কি বেড়াতে ভালো লাগে? লোকটা বলছিল, ওরা সবাই চরণামৃত খেয়ে নিরাপদ রয়েছে। আমিও তাই খাবো নাকি? হয়তো বা চরণামৃতের বীজাণুধ্বং-সী কোনো ক্ষমতা আছে, নেই যে, তা কে বলতে পারে?... হ্যাঃ ওর যেমন কথা! ওটা স্রেফ অ্যাকসিডেন্ট কলকাতার সব বাড়িতেই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না। তাছাড়া মনের জোরে

রোগ প্রতিরোধের শক্তি জন্মায়—মারীরও যেখানে মার—সেই মনের জোরই ওদের পক্ষে একটা মস্ত সহায়—কিন্তু ওই যৎসামান্য পাথরটাকে দেবতাজ্ঞান করার মতো বিশ্বা-সের জোর আমি পাবো কোথায়?

এ সব যা-তা না করে সকালে টিকে নেওয়াই উচিত ছিল, হয়তো তাতে আটকাতো। এখুনি গিয়ে টিকেটা নিয়ে ফেলব নাকি? টিকে নিলে শুনেছি বসন্ত মারাত্মক হয় না, বড় জোর হাম হয়ে দাঁড়ায়। আর হামে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ও তো শিশুদের হামেশাই হচ্ছে। নাঃ, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই বেরিয়ে পড়ি।

টিকে নিয়ে অশথতলার পাশ দিয়ে ফিরতে লোকটার সকালের কথাগুলো মনে পড়ল। হয়তো ঠিকই বলেছে সে সত্যিই এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো জবাব নেই, সেখানে রহস্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাবো? শেকসপীয়ারের সেই কথাটা—সেই স্বর্গমর্ত-হোরাশিও-একাকার-করা বাণী—না, একেবারে ফেলনা নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুদূর নক্ষত্রলোক এবং তার বাইরেও বহুধা বিস্তৃত অনন্ত জগতের কতটুকুই আমরা জানি? কটা ব্যাপারেই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারি? যতই বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ি না কেন, শেষে সেই অজ্ঞেয়ের সীমান্তে এসে সব ব্যাপারীকেই নতমুখে চুপ করে দাঁড়াতে হয়।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে আসতে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে মনে মনে দণ্ডবৎ জানালামা প্রার্থনা করলাম, বাবা, আমার মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এযাত্রা।

খানিক দূর এগিয়ে এসে ফিরলাম আবার। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুসকুড়িগুলো হাত দিয়ে আঁচ করা গেল—এগুলো ব্রণ, না বসন্ত?

এবার মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—জয় বাবা ত্রিলোকনাথ! রক্ষা করো বাবা! বম বম!

উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখলাম কেউ দেখে ফ্যালেনি তো?

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

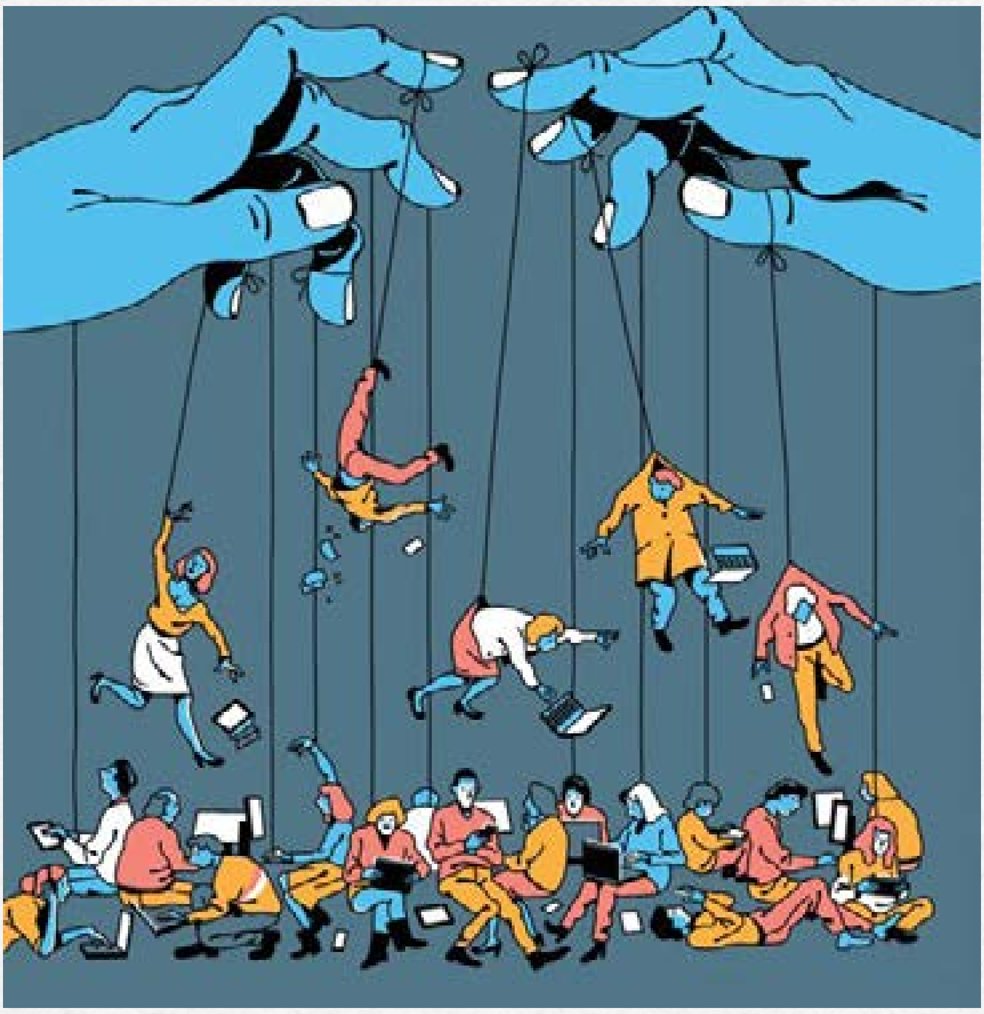
"প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিব মন্দির। তারপর ভেবে দেখলাম সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিঁদুরাই আসবে। মুসলমান, ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না তার। মসজিদ গড়ালেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউ ঘেঁষবে না তার দরজায়। গির্জা হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্ম সমন্বয় আর হয় না। তাছাড়া, পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ, গির্জা গড়লে একদিন হয়তো মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই পায়খানা বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু মুসলমান জৈন পার্শী ফেরেস্তান। কেউ বাকী থাকিবে না।"

- শিবরাম চক্রবর্তী

সূচিপত্র

শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে

- প্রবীর ঘোষ



সময় এগোচ্ছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে খসে পড়ছে অনেক সংস্কার, অনেক মূল্যবোধ। মানুষ অনেক পুরোনো ধ্যান-ধারণা বিদায় দিচ্ছে। মানুষের এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধনীরাও শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল বের করছে, বের করছে গরিব মানুষগুলোর মাজ ধোলাইয়ের নানা প্যাচ-পয়জার। এইসব কূট কৌশল যেমন ধনীদের ভাড়া করা কিছু বুদ্ধিমান মানুষদের মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে, তেমনই কিছু কিছু বুদ্ধিমানদের কাছে সে-সব ধরাও পড়ে যাচ্ছে। এই সব বিক্রি না হওয়া বুদ্ধিমানদের কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন বঞ্চিত মানুষদের ঘুম ভাঙাতে। তাঁদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছে নানা সংগঠন, নানা গোষ্ঠী।

এইসব সংগঠন ও গোষ্ঠী বঞ্চিতদের ধোলাই করা মগজ আবার ধোলাই করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে নতুন চিন্তা, গড়ে তুলছে নতুন চেতনা, গড়ে উঠছে নতুন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ। হুজুরের দল অবশ্যই এই অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে এক সময় বঞ্চিত মানুষগুলোর সোচ্চার দাবি ও ক্ষোভকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য-পাট ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেয় না। ওরা অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে তোলে, প্রতিআক্রমণ চালায়। শোষকরা ভালোমতোই জানে সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখে দাবিয়ে চলার মতো পুলিশ ও সেনা

রাষ্ট্র-শক্তির নেই। তাই নানা কৌশলে চেষ্টা করে শোষিত ক্ষুব্ধ মানুষগুলোকে দমিয়ে রাখতে বিভিন্ন পন্থা ও কৌশলের সাহায্য নিতে।

নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের লড়াইতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার পুরোটা যেহেতু ধনী হুজুরের দলই জোগায় তাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলকারী রা-জনৈতিক দল বা রাষ্ট্রশক্তি হয়ে দাঁড়ায় ধনীদের বিশ্বস্ত 'যো-হুজুর' -এর দল।

এরই সঙ্গে হুজুরের দল আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর বিবেক কিনতে বাজারে নেমে পড়ে। টপাটপ বিক্রিও হয়ে যায় অনেকেই। শোষিত মানুষগুলোর মগজ ধোলাই করতে হুজুরের দল ময়দানে নামিয়ে দেল রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের। নেমে পড়ে সরকারি ও ধনী মালিকানা-ধীন প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। মগজ ধোলাই করা হতে থাকে প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ভাবে। পাশাপাশি তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা জনমানসে বাড়াবার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রয়োজনে জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক নানা চিন্তাকে উসকে দেওয়ার নানা কৌশলও টপাটপ বের করতে থাকে হুজুরের উচ্ছিষ্টভোগী পরামর্শদাতা ও দালালের

দল। ভক্তিরসের বান ডাকানো হতে থাকে নানা ভাবে। অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরি করতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির কৌশলেই কাজ হয়। জ্যোতিষ ও প্যারাসাইকোলজিস্ট নামধারী প্রবঞ্চকের দল রাষ্ট্রশক্তির আসকারায় তাঁদের উদ্ভট সব চিন্তা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে নিজেদের আখের গোছাবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। প্রতিটি ক্লাব, গণসংগঠন, লাইব্রেরি, স্কুল, কলেজকে কুক্ষিগত করে নিজেদের ইচ্ছেমতো সাংস্কৃতিক চেতনা মাথায় ঢোকাতে কখনও রাজনৈতিক দলগুলোকে কাজে লাগায় হুজুরের দল। কুক্ষিগত করার জন্য লোভ, ভয়, বলপ্রয়োগ ইত্যাদিকে পাথেয় করে রাজনীতি পেশার মানুষগুলো। কখনও বা সাহায্যের বদান্যতায় সংস্থাগুলোর ইচ্ছেমতো চলার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। আবার কখনও বা ওইসব সংস্থার নেতাদের বিবেক কিনেই সংস্থাকে পকেটে পুরে ফেলে হুজুরের দল। কখনও নিজেদের বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে ওই ধরনের সাজানো আন্দোলন শুরু করা হয়; আন্দোলনে শামিল মানুষদের বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টায়। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রশক্তি আন্দোলনকারীদের দেশের সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে জাতীয়তাবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, ইত্যাদি ছাপ মেরে দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকারি, বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোর নিরবচ্ছিন্ন প্রচারে শোধিত মানুষদের এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে দেশের শোষিত মানুষরাই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

কখনও বা সওদা হতে না চাওয়া উন্নত শির, বিপদজনক নেতাদের চরিত্র হননের নানা

প্রচেষ্টা চালানো হয় সাজানো আন্দোলনকারীদের সাহায্যে।

কখনও বা নেতাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে গুলিবিনিময়ের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়। অথবা গল্প ফাঁদা হয় পতিতাপল্লি রেইড করতে গিয়ে ধরাপড়া নেতার গুলি বিনিময় এবং মৃত্যুর।

এই যে কথাগুলো লিখেছি, এর একটা কথাও কল্পনাপ্রসূত নয়। যখনই কোনও দরিদ্র শোষিত জনগোষ্ঠী ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে, আঘাত হেনেছে হুজুর-দের দুর্গে, তখনই সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে শোষক-শ্রেণি ও তার সেবক রাষ্ট্রশক্তি এই পদ্ধতিগুলোকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করে চলেছে।

যারা শোষণ করছে তারা চায়, যাদের শোষণ করছি তাদের এমন নানা নেশায় ভুলিয়ে রাখব, মাতিয়ে রাখব যে তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকবে যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোনও দিনই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আন্দোলনকে জয়ী দেখতে চাইলে হুজুরের দল ও তাদের রক্ষার দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার আন্দোলন ধ্বংস করতে কী কী কৌশল গ্রহণ করে থাকে সে বিষয়ে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। সম্ভাব্য আক্র-মণ বিষয়ে অবহিত থাকলে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা এবং পাল্টা আক্রমণ চালানো সহজতর হয়।

শোষকশ্রেণি বা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন যাঁরা চালাবেন তাঁদের এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, প্রতিটি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির ওপর যথেষ্ট নজর রাখে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার। সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের রয়েছে বহু বিভাগ। আমাদের সরকারের ইন্টেলিজেন্ট ডিপার্টমেন্টেরই রয়েছে তিরিশের ওপর বিভাগ বা সেল। ছাত্র, রাজনৈতিকদল, ডাকাত অপরাধ, নকশাল সংগঠন ইত্যাদি প্রত্যেকটা বিভাগের জন্যে রয়েছে সেল। গোয়েন্দারা এইসব সংগঠনগুলোর ওপর নজর রাখেন। এ-ছাড়াও গোয়েন্দা দপ্তরের ও বিভিন্ন থানারই রয়েছে নিজস্ব ইনফর্মার। এই ইনফর্মাররা প্রতিটি সেলেই তথ্য জোগাচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। এরা সরকারি চাকরি করে না। এদের আত্ম-পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে এক একজন বড় পুলিশ অফি-সারদের হাতে থাকে সরকারি খরচে নিজস্ব বিশ্বস্ত ইনফর্মার।

এরা কোথায় নেই? কোনও সংগঠন সরকারের পক্ষে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে সন্দেহ করলেই তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনফর্মার। এ-ছাড়া গোয়েন্দারাও নজর রাখেন। সুতরাং বহু আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিষয়েই সরকার ও শোষকশ্রেণি সব সময়ই ওয়াকিবহাল। বিভিন্ন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝে তাকে রুখতে সরকার হাজির করে নানা কৌশল।

এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য কৌশল হল, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে নিজের প্রয়োজনীয় খাতে নিয়ে যাওয়া।



মানুষের চিন্তাধারাকে কোনও একটা বিষেষ খাতে বওয়াতে, চিন্তায় কোনও বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে গাঁথতে যে পদ্ধতিটি এখনও সবচেয়ে বেশি সফল বলে স্বীকৃত, তা হল অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সুযোগ পেলেই মিথ্যেকেও বার বার নানা ভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করতে থাকা। কোনও একটি মিথ্যে বিশ্বাসকে মানুষের মাথায় সত্যি বলে ঢোকাতে হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচার করে ওই বিশ্বাসে তোমার এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির রয়েছে অগাধ আস্থা ও অচল ভক্তি। সফল

রাজনীতিকদের এসব বিষয় জানতে হয়, নইলে শিল্পপতিদের কাছে কলকে পাওয়া যায় না। ওরা ধৈর্য ধরে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণকে মাঝে মধ্যেই জানাতে থাকে ওদের জ্যোতিষ-বিশ্বাস ও জ্যোতিষ নির্ভরতার কথা, ঈশ্বর বিশ্বাস ও অলৌকিক ক্ষমতাবান ধর্মগুরুদের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তির কথা। এতে কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মগুরুর শিষ্যদের ভোট প্রভাবিত হয়, জনসাধারণের মধ্যে জ্যোতিষ ও ভাগ্য-নির্ভরতা বাড়তে থাকে। কর্মফলে বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, গুরুনির্ভরতা ইত্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-বিশ্বাস হ্রাস পেতে থাকে। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ আত্মনিবেদন করতে জানে, আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে দুঃখ ও বঞ্চনাকে ভুলতে জানে কিন্তু লড়াকু হতে জানে না। যে মানুষ লড়াকু নয়, তাকে আবার ভয় কী?

মার্কসবাদের সঙ্গে অপরীক্ষিত এবং শুধুমাত্র বিশ্বাসনির্ভর জ্যোতিষশাস্ত্রের চূড়ান্ত বিবাদ থাকলেও কিছু কিছু মার্ক-বাদী মন্ত্রী কিন্তু জ্যোতিষীদের সম্মেলনে হাজির হন প্রধান অতিথি, সভাপতি ইত্যাদি হয়ে। ওইসব সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী-টানিও পাঠান। মেহনতী মানুষের বন্ধু ওইসব মার্কসবা-দী দলগুলো তাদের মন্ত্রীদের এমন মার্কস-বাদ-ই কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার ফতোয়া জারি করেন না কেন? কেন এমন অদ্ভুত আচরণ? ওইসব কার্যকলাপ কি শুধুই মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত চ্যুতি বা নীতিভ্রষ্টতার নিদর্শন? না কি ক্ষমতার শাঁসে জলে থাকার পরিণতিতে সাধারণ মানুষের চেতনাকে অদৃষ্টবাদী করে তোলার কূট কৌশল ?

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন ওইসব তথাকথিত অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতারা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদ বিরোধী চরমবাস্তববাদী। ‘ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবেই’ বলে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দলই নির্বাচনের লড়াইতে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না।

মিটিং, মিছিল, প্রচারের বিশাল ব্যয়, কর্মী, পেশিশক্তি, আগ্নে-য়াস্ত্র জোগাড়, বোমের স্টক, জালিয়াতির নব-নব কৌশলকে কাজে লাগানোর প্রয়াস, বুথ দখল ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিরোধী প্রার্থীকে টেক্কা দিয়েই জেতার চেষ্টা করে।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"যুক্তিবাদী মানসিকতাই জনগনকে পরিচালিত করবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, আমলাতন্ত্র ঘোচানোর সংগ্রামে, বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে। এগুলো কোনটাই পৃথক-পৃথক ব্যাপার নয়, পরস্পর সম্পর্কিত।"
-প্রবীর ঘোষ

*পত্রিকায় ব্যবহৃত ছবিঋণ পিন্টারেস্ট এবং অন্যান্য।

সূচিপত্র

চেতনার অন্বেষণে : মুক্তচিন্তক সাময়িকী

এপ্রিল সংখ্যা ২০২৩ | ছাব্বিশতম

পরিকল্পনা ও রূপায়ণে

অভিষেক, সৌভিক, মধুমিতা, অরিন্দম, সজল, উপেন,
কিনোক্ষ্যাপা ও সৌমেন

| বিনিময় মূল্য নাই



"ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবল টাকায়। যদি মন্দির, মসজিদ, গির্জায় পয়সা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ছ'মাসেই ঈশ্বর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

\- পেরিয়ার রামস্বামী (১৮৭৯-১৯৭৩)

লেখা পাঠানোর উপায় ও নিয়ম

কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখবেন:

- বিষয়: বিষয়–মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।
- লেখার ধরন: গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি।
- শব্দ সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নেই।
- লেখারশর্ত: লেখায় কোনপ্রকারপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। কুসংস্কার ছড়ায় এমন কিছু থাকলে লেখা বাতিল হয়ে যায়।
- সময়সীমা: প্রতিমাসের ২৫ তারিখের আগে পাঠান। ২৫ তারিখের পর পাঠালে পরের মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- লেখা পাঠানোর ইমেইল:
  yukbadira@gmail.com
  হোয়াটসঅ্যাপ: +91-94337-94113

প্রকাশিত কিছু সংখ্যা

ভগৎ সিং সংখ্যা

গৌরীলংকেশ সংখ্যা

অভিজিৎ রায় সংখ্যা

বিশেষ আইনি সংখ্যা

গ্রাহক হোন

পত্রিকার প্রতিমাসে ইমেইলে পেতে গুগল ফর্ম পূরণ করুন

ফর্ম লিংক

টেলিগ্রামে সার্চ করুন

@Yktibadira

QR for Subscription



যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত একটি মাসিক অনলাইন যুক্তিবাদী পত্রিকা

Email: yuktibadira@gmail.com, WhatsApp: +91-94337-94113

Editor-in-chief: Prasenjit Konar, Kolkata - 700056